

কৃষি অর্থনীতি

AGRICULTURAL ECONOMICS

BAE 6202

স্কুল অফ এগ্রিকালচার এণ্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্স ডিভেলপমেন্ট টিম

লেখক

ড. মু. আবদুস সাত্তার মন্ডল
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শামসুল আলম মোহন
সমবায় ও বিপণন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী
মোঃ বিলাল হোসেন
স্কুল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রচনামূলক সম্পাদক

মোঃ বিলাল হোসেন
স্কুল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বয়কারী

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
স্কুল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এ কোর্সবইটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্কুল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট-এর ছাত্রদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে

Mahbubul Alam

University of Rajshahi

কৃষি অর্থনীতি

(KRISHI ORTHONITI)
AGRICULTURAL ECONOMICS

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি : ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য : মৃ. মুস্তাফিজুর রহমান
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবু তালেব

মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী

মোঃ শাহ আলম সরকার

ডা. আন ম আমিনুর রহমান

মোঃ মোশেদুর রহমান

মোঃ বিলাল হোসেন

আবু সাদেক মোঃ সেলিম

মোঃ নূরুল ইসলাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক

ডীন, স্কুল অফ এগ্রিকালচার এণ্ড রুর্যাল ডিভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

AGRICULTURAL ECONOMICS (KRISHI ORTHONITI) a 2 Credit Coursebook for the Bachelor of Agricultural Education Programme. **Written by** : Dr. M. A. Sattar Mandal and Dr. Shamsul Alam Mohon. **Edited by** : Md. Sorowar Hossain Chowdhury & Md. Bilal Hossain. **Style Edited by** : Md. Bilal Hossain. **Published by** : Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1704. © School of Agriculture and Rural Development, Bangladesh Open University. **First Edition** : July, 1998. **Computer Compose & DTP Operator** : Md. Shakhawat Hossen. **Cover Design** : Md. Monirul Islam, **Cover Photographs Provided by** : Md. Bilal Hossain. **Illustration** : Masud Mahmud Mallik. **Printed by** : Nandini Printing and Publication, 55/B Inner Circular Road, Dhaka.

ISBN 984-34-5028-0

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any means without prior permission of the copyright holder.

ইউনিট ১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি	১-১৪
পাঠ ১.১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির সংজ্ঞা, পরিধি ও পার্থক্য	১
পাঠ ১.২ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব	৫
পাঠ ১.৩ জমির মালিকানা, খামারের আয়তন ও কৃষকের শ্রেণিবিভাগ	৮
পাঠ ১.৪ ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সংস্কার	১১
ইউনিট ২ উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনবিধি	১৫-৩৬
পাঠ ২.১ উপযোগের সংজ্ঞা, ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধি	১৫
পাঠ ২.২ চাহিদার সংজ্ঞা, চাহিদাবিধি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, কৃষিপণ্যের চাহিদা	১৮
পাঠ ২.৩ যোগান, যোগানবিধি, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং কৃষিপণ্যের যোগান	২৫
পাঠ ২.৪ উৎপাদন উপাদান, কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ	৩০
ইউনিট ৩ বাজার ও কৃষিক্ষণ	৩৭-৬৫
পাঠ ৩.১ বাজার ও বাজারের শ্রেণিবিভাগ	৩৭
পাঠ ৩.২ বাজারে দাম নির্ধারণ	৪১
পাঠ ৩.৩ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ও সমস্যাসমূহ	৪৬
পাঠ ৩.৪ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ী ঋণ ব্যবস্থা	৫০
পাঠ ৩.৫ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার কার্যাবলী	৫৪
পাঠ ৩.৬ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা	৫৮
পাঠ ৩.৭ কৃষিক্ষণের বিতরণ সমস্যা	৬১
ইউনিট ৪ খামার ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা	৬৭-৯৬
পাঠ ৪.১ খামার ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা	৬৭
পাঠ ৪.২ খামার পরিকল্পনা ও বাজেটিং	৭১
পাঠ ৪.৩ খামার স্থাপন	৭৫
পাঠ ৪.৪ খামারের রেকর্ড প্রণয়ন	৭৯
পাঠ ৪.৫ শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন	৮২
পাঠ ৪.৬ খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ	৮৬
ব্যবহারিক	
পাঠ ৪.৭ শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন	৯১
পাঠ ৪.৮ খামারের রেকর্ড প্রণয়ন	৯২
পাঠ ৪.৯ একটি বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি	৯৩
পাঠ ৪.১০ একটি খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ	৯৪

পাঠ নির্দেশতা

“কৃষি অর্থনীতি” কোর্সবইটি বিশেষভাবে স্কুল অভ্যন্তরীণ ক্যালেন্ডার এন্ড র‍্যাপাল ডিভেলপমেন্ট এর বিএগএড প্রোগ্রামের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনি জানেন, দূরশিক্ষায় শিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। তাই পাঠের কোনো কঠিন বিষয় যেন আপনার বুঝতে অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কোর্সবইটি লেখা হয়েছে। কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা তাই প্রচলিত পন্থাবই থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কোর্সবইটি আপনাকে নিজে পড়ে বুঝতে হবে, তাই এটি কীভাবে পড়বেন প্রথমেই তা জেনে নিন। এতে কোর্সবইটি পড়তে ও বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

কোর্স বইটির রূপরেখা

“কৃষি অর্থনীতি” কোর্সবইটি চারটি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে একবিক পত্র রয়েছে। পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউনিটের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। ইউনিটের পত্রগুলিকে আলোচনা করে সাজানো হলো এ এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ কোর্সবইটির ইউনিট ১ ও ৪ এর পটভূমিকা রচনা করেছেন ড. মু. আবদুস সাত্তার মন্ডল, প্রফেসর, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং ইউনিট ২ ও ৩ এর পটভূমিকা রচনা করেছেন ড. শামসুল আলম মোহন, প্রফেসর, সমবায় ও বিপণন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

ইউনিটের ভূমিকা



প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় ইউনিটের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিটটিতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও উল্লেখ রয়েছে। এতে আপনি ইউনিটের শুরুতেই জেনে যাচ্ছেন পাঠের মূল আলোচ্যসূচি কী?


পাঠের উদ্দেশ্য


লক্ষ্য করবেন প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পাঠের বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কি—না তা নিজে নিজেই মূল্যায়ন করবেন। এজন্য পাঠ শেষে স্বমূল্যায়ন প্রশ্ন অর্থাৎ পাঠোত্তর মূল্যায়ন রয়েছে। এতে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পারলেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন।


আইকনের (Icon) ব্যবহার

পাঠের বিষয়বস্তুগুলো একদৃষ্টিতে বুঝে নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে কোর্সবইটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা আইকন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে আপনি সহজেই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং আপনার করণীয় কী তা বুঝতে পারবেন। নিম্নে এ কোর্সবইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আইকনের অর্থ নির্দেশ করা হলো—

 +  = পড়ুন ও লক্ষ্য করুন

 = পাঠের উদ্দেশ্য

 = সারমর্ম/ আবশ্যিক পাঠ

 = ছবি দেখুন



= অনুশীলন/ চূড়ান্ত মূল্যায়ন



= পাঠোত্তর মূল্যায়ন



= উত্তরমালা

বক্স লিখন



পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় অংশকে আরও আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই “বক্স লিখনের” মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি “বক্স লিখন” মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

অনুশীলন

আপনি পাঠটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন কি-না তা যাচাই করার জন্য পাঠের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় দেয়া রয়েছে অনুশীলন। অনুশীলনগুলো আপনাকে সমাধা করতে হবে। এসব অনুশীলন আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সারমর্ম

প্রতিটি পাঠেই সারমর্ম দেয়া আছে। সারমর্ম পড়ে আপনি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা নিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। পাঠটি ভালোভাবে বোঝার পর পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনার দেয়া উত্তর ইউনিট শেষে দেয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। সবগুলো উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠ শুরু করুন অন্যথায় পাঠটি পুনরায় পড়ুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রতি ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য তথ্যসূত্রের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাথেও কথা বলতে পারেন। ইউনিটের সবগুলো পাঠ ভালোভাবে পড়লে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো সমাধানে কোনো অসুবিধা হবে না।

ইউনিট ১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি

ইউনিট ১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি

প্রত্যেকটি সমাজের উৎপাদনকারীকে দৈনন্দিন জীবনে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কী দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে এসব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হবে, এবং কারা এবং কীভাবে এসব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ভোগ করবে। এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা অর্থনীতিশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। বিশেষ করে, কৃষি প্রধান দেশের জন্য কোন্ জাতের ফসল, মাছ বা গবাদি পশু কোন্ পদ্ধতিতে উৎপাদন করলে কৃষকের লাভ বাড়বে বা পারিবারিক ভোগের চাহিদা মিটবে বা তৃপ্তি সর্বাধিক হবে - কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করলে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। এ ইউনিটের পাঠ শেষে, অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা, জমির মালিকানা ও খামার আয়তন এবং বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও ভূমিসংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।



পাঠ ১.১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির সংজ্ঞা, পরিধি ও পার্থক্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও পরিধি এবং এ দুটো বিষয়ের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জমির মালিকানা, খামারের গড় আয়তন, জমির খন্ডায়ন ও বিভাজন এবং কৃষকের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।



অর্থনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা

অর্থনীতি শাস্ত্রের সর্ব প্রথম সংজ্ঞাটি দেন এ্যাডাম স্মিথ। তাঁর মতে, “অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।” তাঁর মতে, সম্পদ আহরণই হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দিক থেকে সংজ্ঞাটি অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে অনেকটা সংকুচিত করে ফেলে। লর্ড কীন্স এর ভাষায়, “অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজবদ্ধ মানুষের আয় ও নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনা।”

অর্থনীতিশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক এল. রবিন্স। তাঁর সংজ্ঞানুসারে, “অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ সম্পর্কিত মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীর আলোচনা করে। এ সংজ্ঞাটি মানব জীবনের তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

- মানব গোষ্ঠীর রয়েছে অসীম অভাব,
- অসীম অভাবগুলো পূরণের জন্য যে সম্পদ রয়েছে তা দুষ্প্রাপ্য ও সীমিত, এবং
- এসব দুষ্প্রাপ্য ও সীমাবদ্ধ সম্পদগুলোর রয়েছে বিকল্প ব্যবহার।

মোট কথা, সমাজবদ্ধ মানুষ কীভাবে তাদের অসংখ্য অভাব ও লক্ষ্যগুলোকে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বা উপকরণগুলো দ্বারা পূরণের বা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাই হচ্ছে অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। যেহেতু অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষ নিয়ে আলোচনা করে সেহেতু এ বিষয়টিকে একটি সমাজ বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবদ্ধ মানুষ কীভাবে তাদের অসংখ্য অভাব ও লক্ষ্যগুলোকে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বা উপকরণগুলো দ্বারা পূরণের বা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাই হচ্ছে অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু।

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষি খাতের সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধানে অর্থনীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে। অধ্যাপক ওয়েন ম্যাকার্থি প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, “কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা কৃষি খাতের যে কোনো দিকের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে এমন সব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য ও সীমিত উপকরণসমূহ দ্বারা মানুষের বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণসম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী আলোচনা করে।” কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্র হচ্ছে অর্থনীতির তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কীভাবে কৃষিখাতে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদসমূহ দ্বারা বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

বিষয়বস্তু : কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

- কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সম্পদের মালিকানা ও বন্টন (ভূমি, শ্রম, মূলধন, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি)।
- কৃষি পণ্য ও উপকরণ সমূহের চাহিদা যোগান, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন।
- সরকারী নীতিমালা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন ও তার ভোগকে প্রভাবিত করে।
- কৃষি খাতের সাথে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের সম্পর্ক এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর কৃষি খাতের প্রভাব।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন-সমবায়, ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক, সেচ গ্রুপ, বিপণন সংস্থা, ইত্যাদি।

অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের পরিধি ও পার্থক্য

কৃষি অর্থনীতিও একটি সমাজবিজ্ঞান। কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, ব্যবসায়ী, যোগানদাতা সকলেই কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

অর্থনীতি	কৃষি অর্থনীতি
<ul style="list-style-type: none"> • অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ সকল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। 	<ul style="list-style-type: none"> • কৃষি অর্থনীতিও একটি সমাজবিজ্ঞান। কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, ব্যবসায়ী, যোগানদাতা সকলেই কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।
<ul style="list-style-type: none"> • অর্থনীতিশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যেমন- অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে। 	<ul style="list-style-type: none"> • কৃষি অর্থনীতি কৃষির বিভিন্ন খাত যেমন- শস্য, মাৎস্য, গবাদিপশু, বনায়ন ইত্যাদি খাতে নিয়োজিত মানুষের অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।
<ul style="list-style-type: none"> • সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে মানুষের অসীম অভাবকে পূরণ করা যায় তাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। 	<ul style="list-style-type: none"> • কৃষির জন্য প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বাড়ানো যায় তাই কৃষি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
<ul style="list-style-type: none"> • অর্থনীতিশাস্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ও সমাধান বের করতে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ শৃংখলাবদ্ধভাবে ব্যবহার ও পরিবেশন করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 	<ul style="list-style-type: none"> • কৃষি অর্থনীতি একটি আধুনিক প্রায়োগিক বিজ্ঞান, যা কৃষি সম্পদের ব্যবহার, উপকরণ বন্টন, ঋণদান, ভর্তুকি, পণ্যমূল্য ও বিপণন, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা বাতলে দেয়।
<ul style="list-style-type: none"> • অর্থনীতিশাস্ত্র একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে নিরপেক্ষভাবে কেবল অর্থনীতির সমস্যাগুলোই বিচার বিশ্লেষণ করেনা, একটি কল্যাণকর নীতিবিজ্ঞান হিসাবে তা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানসমূহেরও ইঙ্গিত দেয়। 	<ul style="list-style-type: none"> • কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে কেবল তথ্য সহকারে বিশ্লেষণই করেনা, কৃষি উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে কেবল তথ্য সহকারে বিশ্লেষণই করেনা, কৃষি উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

কৃষি অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

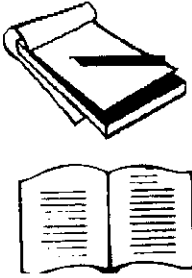
কৃষি অর্থনীতি বিষয় পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কৃষিখাতে যেসব অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তার বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ ও সমাধান বাতলে দেয়া। এর থেকে জানা যায়,

- ক. কী ধরনের ও কী পরিমাণে কৃষি পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে,
- খ. কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোন উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহার করলে লাভ সর্বাধিক হবে এবং
- গ. উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কীভাবে ভোক্তাদের মাঝে বন্টিত হবে।

কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য প্রধান প্রধান কতকগুলো শাখায় পাঠ নিতে হয়। যেমন, খামার পর্যায়ে উৎপাদনের লাভক্ষতি নিরূপণের জন্য কৃষি উৎপাদন অর্থনীতি ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে হয়। কৃষি পণ্যের দাম ও বিপণন সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য কৃষি মূল্য ও বিপণন বিষয়ে পাঠ করতে হয়। কৃষি অর্থ-সংস্থান ও মূলধন সংগঠন বিষয়গুলো খামার পর্যায়ে মূলধন সংগঠন ও ঋণদান ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ওপর ধারণা পাবার জন্য কৃষি সমবায় ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বিষয় পাঠ করতে হয়।

মোটকথা, কৃষি অর্থনীতি একটি সমন্বিত সমাজ বিজ্ঞান, যার মধ্যে মূল অর্থনীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগের অর্থনৈতিক দিকে অনেকগুলো প্রায়োগিক বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে।

অনুশীলন (Activity) : আপনার মতে অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? যদি থেকে থাকে তবে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করুন।



সারমর্ম : অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি সমাজবিজ্ঞান যা বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী আলোচনা করে। এর প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে : (১) মানুষের অভাব অসীম; (২) অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ সসীম ও দুষ্প্রাপ্য; এবং (৩) সম্পদগুলো বিকল্প ব্যবহার যোগ্য। অপরদিকে, কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের মূল কথা হচ্ছে কীভাবে অর্থনীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কৃষিখাতে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বা উপকরণ দ্বারা বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণ করা যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. প্রত্যেক সমাজের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে—
- কী কী দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হবে
 - কীভাবে এগুলো উৎপাদন করা হবে
 - কার এবং কীভাবে এগুলো ভোগ করবে
 - উপরের সবগুলো।
- খ. কোন্টি অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল উপাদান নয়?
- মানুষের অভাব অসীম
 - সম্পদ সীমিত
 - সম্পদসমূহ ব্যয়বহুল
 - সীমিত সম্পদগুলোর বিকল্প ব্যবহার রয়েছে।

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই।
- খ. কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করে এবং যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন

- ক. অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে সম্পদের ব্যবহার।
- খ. কৃষি অর্থনীতি একটি আধুনিক বিজ্ঞান।

৪। একবাক্যে বা কথায় উত্তর দিন।

- ক. কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের মূল কথা কী?
- খ. কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করলে কী জানা যায়?



পাঠ ১.২ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কৃষি ও কৃষি খাত বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- কৃষি প্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি কোন্ খাতে কীভাবে কতটুকু অবদান রাখে তাও বুঝতে পারবেন।
- উন্নত প্রযুক্তি প্রসার লাভ করলে কৃষির অবদান বাড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারবেন।



কৃষি ও কৃষিখাত

কৃষি বলতে একসময় কেবল জমি চাষ করে তাতে ফসল উৎপাদন করা বোঝাত। আধুনিক কালে কৃষি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। এর মধ্যে পড়ে শস্য উপখাতসহ সকল প্রকার উপখাতসমূহ যেমন, মাংস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাস মুরগী পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, রেশম চাষ, মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন, গৃহাঙ্গনে সজি ও ফুলের চাষ, ইত্যাদি। কৃষি এখন বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে কৃষি এক গতিশীল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডও বটে।

কৃষিখাত বলতে কেবল উপরিবর্ণিত কৃষি উৎপাদনের উপখাতগুলোকেই বোঝায় না। কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, কৃষি পণ্যের বিপণন ও পরিবহণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা, কৃষি সমবায় ইত্যাদি সেবাগুলোও কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে ব্যাপক অর্থে কৃষি সেবা খাত বলে অভিহিত করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা

বাংলাদেশের মত একটি কৃষি প্রধান দেশে কৃষির ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। এদেশের প্রায় ১৩ কোটি জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বসবাস করে, যারা জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক পেশার ওপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধানত: কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে তা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. কৃষি খাদ্যের যোগান দেয় :

কৃষি একটি দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য সকল প্রকার খাদ্যের যোগান দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬/৯৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষের জন্য মাথাপিছু ১৬ আউন্স হিসাবে মোট ২ কোটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যাশস্যের প্রয়োজন ছিল। ঐ বছর কৃষিখাত উৎপাদন করেছে মোট ২ কোটি ৪ লাখ টন খাদ্যাশস্য, যার মধ্যে প্রধানত: চাল ও গম রয়েছে। খাদ্যাশস্যের এই যোগান ছাড়াও কৃষি খাত প্রতিবছর প্রায় ১৪ লক্ষ টন মাছ, প্রায় ১৪ লক্ষ টন দুধ, ৫ লক্ষ টন মাংস এবং প্রায় ২৫৪ কোটি ডিম উৎপাদন করেছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো অত্যন্ত কম। কৃষি এসব খাদ্যের যোগান দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে কেবল বাঁচিয়ে রাখে তাই নয়, পরোক্ষভাবেও খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দিয়ে মানুষের শ্রমশক্তি ও কর্মক্ষমতা টিকিয়ে রাখছে। এটিই কৃষির সবচেয়ে বড় ও মৌলিক অবদান।

২. কৃষি শিল্পে কাঁচা মালের যোগান দেয় :

কৃষি শিল্প উৎপাদনের জন্য কলকারখানায় কাঁচামাল যেমন- পাট, তুলা, চামড়া, কাঠ ইত্যাদি যোগান দেয়। কৃষি থেকে কাঁচামাল হিসাবে যে তুলা সরবরাহ করা হয় তা থেকেই তৈরি হয় আমাদের বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ। এভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে উৎপাদন যোগসূত্র গড়ে উঠে। মোটকথা, কৃষির উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে একটি দেশের শিল্পায়ন নির্ভর করে।

৩. কৃষি অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয় :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয়া হয়। শিল্পায়ন ও নগর উন্নয়নের ফলে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে, কৃষিখাত থেকে দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিক শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। এতে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠে। রাস্তাঘাট ও দালান কোঠা নির্মাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতেও গ্রামাঞ্চল হতে শ্রমিকের যোগান দেয়া হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয়া হয়। শিল্পায়ন ও নগর উন্নয়নের ফলে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়।

৪. কৃষি মূলধনের যোগান দেয় :

কৃষিখাত থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূলধন অকৃষি খাতে যোগান দেয়া হয়। সাধারণত: ভূমিরাজস্ব, কৃষি-কর ব্যবস্থা, কৃষি মূল্যনীতি, কৃষি পণ্যমূল্যের সাথে শিল্প পণ্যমূল্যের বৈষম্য, ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত আয় অকৃষি খাতে চলে যায় ও বিনিয়োগ হয়।

৫. কৃষিখাত শিল্প পণ্য সামগ্রীর বিশাল বাজার হিসাবে কাজ করে :

কৃষি খাতে নিয়োজিত বিশাল জনগোষ্ঠী শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যেমন- পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র ইত্যাদি ভোগ্য দ্রব্য এবং সার, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে। ফলে এগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদনও বেড়ে যায়। অপর দিকে, কৃষকরা অকৃষিখাতের ভোক্তাদের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে, যার ফলে এসবের বাজার সম্প্রসারিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৬. কৃষি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে :

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি পণ্য রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান উপায়। উন্নত দেশে কাঁচামাল যেমন, পাট, তুলা, চামড়া, ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এ ছাড়াও চা, চিনি, মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করেও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ আসে কৃষি থেকে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ-বছরে কেবল মাত্র পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

৭. কৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে :

কৃষি হচ্ছে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারখানা। বাংলাদেশে মোট জনশক্তির শতকরা ৬৬ ভাগের কর্ম সংস্থান হয় কৃষিতে। একমাত্র মাৎস্য খাতেই প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সেচ-সার প্রযুক্তির প্রসার ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ বিস্তার লাভ করায় কৃষিতে বিপুল কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও আধুনিক পদ্ধতির মাৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাস মুরগী পালন, কৃষি উপকরণ ও পণ্য বাজার জাতকরণ ও পরিবহণ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করায় গ্রামাঞ্চলে বহু বেকার যুবকের স্বকর্ম-সংস্থান হচ্ছে।

৮. কৃষি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে :

বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটি বিরাট উৎস হচ্ছে কৃষি খাত। সাম্প্রতিককালে এদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি.ডি.পি.) ১৮ শতাংশ আসে শস্য খাত থেকে, ৫ শতাংশ মাৎস্য খাত থেকে, ৪ শতাংশ গবাদিপশু ও ৩ শতাংশ বনায়ন খাত থেকে আসে। কৃষিতে আরও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বাড়বে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতেও এ খাত আরও অবদান রাখতে পারবে।

অনুশীলন (Activity) : কীভাবে কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে তা বর্ণনা করুন।

কৃষি হচ্ছে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারখানা। বাংলাদেশে মোট জনশক্তির শতকরা ৬৬ ভাগের কর্ম সংস্থান হয় কৃষিতে।



সারমর্ম : কৃষি বলতে কেবল শস্য উৎপাদন করা বোঝায়না, কৃষির সকল উপ-খাত যেমন শস্য, মাৎস্য, গবাদিপশু, বনায়ন, ফুলের চাষ ইত্যাদিকেও বোঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিমিত। কৃষি খাদ্য, বস্ত্র, শ্রম ও মূলধনের যোগান দেয়। কৃষি শ্রমিকের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে। কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানি করে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এ জন্য কৃষি উন্নয়নের ওপর জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কৃষির প্রত্যক্ষ অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—

- কৃষিখাত শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টি করে
- কৃষি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
- কৃষি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের যোগান দেয়
- কৃষি মূলধনের যোগান দেয়

খ. বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন—

- ২ কোটি ৪ লক্ষ টন।
- ২ কোটি ৫ লক্ষ টন।
- ২ কোটি ১৫ লক্ষ টন।
- ২ কোটি ২৫ লক্ষ টন।

২। সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

ক. কৃষিখাত বলতে শুধু কৃষিজন্মকৃত উৎপাদনকেই বুঝায়।

খ. কৃষি উন্নয়নের উপর জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বাংলাদেশের জি.ডি.পি. এর _____ শতাংশ আসে শস্যখাত থেকে, _____ শতাংশ আসে মাৎস্য খাত থেকে, _____ শতাংশ আসে গবাদিপশু খাত থেকে, এবং _____ শতাংশ আসে বনায়ন খাত থেকে।

খ. কৃষির প্রধান প্রধান উপখাতগুলো হচ্ছে

_____, _____, _____, _____।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কৃষিশিল্প উৎপাদনের জন্য কলকারখানায় কী কী কাঁচামাল যোগান দেয়?

খ. কৃষিখাতে কী পরিমাণ জনশক্তির কর্মসংস্থান হয়।



পাঠ ১.৩ জমির মালিকানা, খামারের আয়তন ও কৃষকের শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জমির মালিকানায় অসম বন্টন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- খামারের আয়তন ও খন্ডায়ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক লিখতে পারবেন।
- কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

জমির মালিকানা



বাংলাদেশে মোট ২ কোটি ২৩ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী দেশে গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২০ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবারের (১২%) কোনো জমি নেই। ৬০ লক্ষ ৪৭ হাজার পরিবারের (৩৪%) জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের কম। এই হিসাবে, বাংলাদেশে কার্যত: ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার, অর্থাৎ মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪৬ ভাগই কার্যত ভূমিহীন।

বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬৩ ভাগ।

বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬৩ ভাগ। জমির মালিকানা ও জমির আবাদ উভয়ক্ষেত্রেই একটি অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন- ১৯৮৩/৮৪ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী নিচের সারণি ১.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষক পরিবারগুলোর শতকরা ৭০ ভাগই ছোট কৃষক, যাদের খামারের গড় আয়তন ২.৫ একরের কম, অথচ এদের মালিকানায় আছে মাত্র ৩১.৭% জমি। অপরদিকে, মাত্র ৫ শতাংশ কৃষক হচ্ছে বড় কৃষক (যাদের খামারের গড় আয়তন ৭.৫ একরের বেশি) অথচ এদের মালিকানায় আছে প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ জমি। বাকি ২৫ ভাগ হচ্ছে মাঝারি কৃষক (যাদের খামারের গড় আয়তন ২.৫-৭.৫ একরের মধ্যে) এবং মালিকানায় আছে প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ জমি।

সারণি ১.১ : বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা এবং তাদের মালিকানাধীন ও আবাদী জমির বন্টন, ১৯৮৩/৮৪

খামার আয়তন (একর)	কৃষকের সংখ্যা (হাজার)	%	মালিকানাধীন জমি (হাজার একর)	%	আবাদী জমি (হাজার একর)	%
ছোট খামার (২.৪৯ একরের কম)	৭০৬৬	৭০.৩	৬৮৮৬	৩১.৭	৬৫৭৩	২৯.০
মাঝারি খামার (২.৫০-৭.৫০ একর)	২৪৮৩	২৪.৮	৯২৭২	৪২.৭	১০২২৬	৪৫.১
বড় খামার (৭.৫০ একরের বেশি)	৪৯৬	৪.৯	৫৫৭১	২৫.৬	৫৮৭৯	২৫.৯
মোট	১০০৪৫	১০০.০	২১৭২৯	১০০.০	২২৬৭৮	১০০.০

খামারের আয়তন ও জমির খন্ডায়ন

উপরের সারণিতে আমরা দেখেছি যে ছোট কৃষকরা সংখ্যায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হলেও তারা আবাদ করে এক-তৃতীয়াংশেরও অনেক কম জমি। অপরদিকে, মাঝারি ও বড় কৃষকরা তাদের সংখ্যার তুলনায় আবাদ করে অনেক বেশি জমি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে গড় আবাদী জমির পরিমাণ ছোট কৃষকদের বেলায় মাত্র ০.৯ একর, মাঝারি কৃষকের বেলায় ৪.১ একর এবং বড় কৃষকের বেলায় ১১.৯ একর। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বাংলাদেশে দিন যত যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষক পরিবারের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, ১৯৮৩/৮৪ সালে

গড় আবাদী জমির পরিমাণ ছোট কৃষকদের বেলায় মাত্র ০.৯ একর, মাঝারি কৃষকের বেলায় ৪.১ একর এবং বড় কৃষকের বেলায় ১১.৯ একর।

যেখানে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৫ হাজার, ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজারে। এর ফলে, কৃষি খামারগুলোর গড় আয়তন দ্রুত কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে যেখানে খামারের গড় আয়তন ছিল ৩.৫ একর, ১৯৮৩/৮৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.৩ একর এবং ১৯৯৬ সালে কৃষি শুমারী অনুযায়ী তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.০২ একরে।

ছোট ছোট প্লট হওয়ায় কলের লাস্তলে জমি চাষ ও সকল জমিতে সমানভাবে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যনীয়। কেবল খামারের গড় আয়তন কমে যাচ্ছে তাই নয়, জন সংখ্যার চাপে জমিগুলো খন্ড বিখন্ড হয়ে ছোট ছোট প্লটে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালের তথ্য অনুযায়ী একেকটি প্লটের গড় আয়তন ছিল ০.৩৫ একর। বর্তমানে প্লটের আয়তন আরও ছোট হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। খামার প্রতি গড়ে প্রায় ৮-১০ টি প্লট আছে এবং প্লটগুলো আবার আইল দ্বারা বেষ্টিত। এক হিসাবে দেখা যায় যে কেবল আইলেই ৫ লক্ষ একর জমি চলে গেছে। ছোট ছোট প্লট হওয়ায় কলের লাস্তলে জমি চাষ ও সকল জমিতে সমানভাবে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও এখানে সেখানে খন্ড বিখন্ড জমি থাকার দরুন সব জমিতে সময়মত ফসল বোনা, পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধান করায় অসুবিধা হয়।

খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে খামারের আয়তনের সঙ্গে উৎপাদনের একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, খামারের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে একর প্রতি উৎপাদন কমে যায়। সাধারণত ছোট কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদন বড় কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়। তবে, অতি ছোট কৃষকদের বেলায় উৎপাদন কিন্তু কম হয়। প্রধানত: মূলধনের অভাবে সময়মত চাষ, বীজ, সার প্রয়োগ করতে না পারার কারণে। মাঝারি কৃষকদের একরপ্রতি ফলন সাধারণত ছোট ও বড় কৃষকদের তুলনায় বেশি হয়।

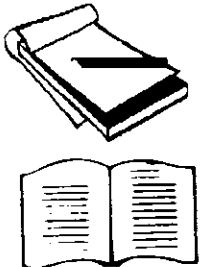
কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ

যারা নিজেদের কিছু জমি চাষ করে এবং আর কিছু জমি অন্যের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে আবাদ করে তাদেরকে বলা হয় আংশিক বর্গাচাষী।

বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, মালিক চাষী, আংশিক বর্গাচাষী ও পুরোপুরি বর্গাচাষী। আবার খামারের আয়তনের দিক থেকে এদেরকে ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষক হিসাবে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার কৃষক পরিবার রয়েছে, যারা আংশিক বা পুরোপুরিভাবে বর্গাচাষী এবং এরা সাধারণত ছোট কৃষক। বর্গাচাষীদের সংখ্যা মোট কৃষক পরিবারের ৩২ ভাগ। বাংলাদেশে পুরোপুরি বর্গাচাষীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ, এদের নিজেদের কিছু জমি আছে এবং আর কিছু জমি অন্যের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে আবাদ করে। এদেরকে বলা হয় আংশিক বর্গাচাষী।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মোট ৮০ লাখ ৬৫ হাজার গ্রামীণ পরিবার কার্যত: ভূমিহীন। এদের মধ্যে ৬০ লাখ ৭৩ হাজার পরিবার খন্ডকালীন বা পুরোপুরিভাবে কৃষিতে মজুরি শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত আছে। কৃষির ব্যস্ত মৌসুমে এসব পরিবার কিছুটা কাজ পেলেও অন্যসময়ে তারা অর্ধবেকার বা পুরোপুরি বেকার থাকে। অবশ্য কৃষিতে সেচ-সার উফশী বীজ প্রযুক্তি প্রসারের ফলে কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থান অনেকটা বেড়ে গেছে।

অনুশীলন (Activity) : কীভাবে জমির খণ্ডায়ন হয়? চাষাবাদে জমির খণ্ডায়নের তাৎপর্য লিখুন।



সারমর্ম : বাংলাদেশে জমির মালিকানা অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান। ছোট কৃষকরা সংখ্যানুপাতে অনেক বেশি হলেও তাদের মালিকানা জমির পরিমাণ অনেক কম। অপরদিকে, মাঝারি ও বড় কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় তাদের জমির পরিমাণ অনেক বেশি। বড় কৃষকদের তুলনায় মাঝারি ও ছোট কৃষকদের (অবশ্য খুব ছোট কৃষকদের বাদ দিয়ে) একর প্রতি উৎপাদন বেশি হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত?

- i. ১২ কোটি-২৫ লক্ষ একর
- ii. ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর
- iii. ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর
- iv. ২ কোটি ৭৫ লক্ষ একর

খ. খামার প্রতি গড়ে প্রায় কয়টি পুট আছে?

- i. ৮-১০ টি
- ii. ১০-১২ টি
- iii. ১২-১৪ টি
- iv. ১৪-১৫ টি

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বড় কৃষকদের তুলনায় মাঝারী এবং ছোট কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদন বেশি হয়।

খ. কৃষক পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগ ছোট কৃষক।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বাংলাদেশ কৃষক পরিবারের সংখ্যা

খ. ছোট কৃষকের খামারের আয়তন একরের কম, মাঝারী কৃষকের খামারের আয়তন একর এবং বড় কৃষকের খামারের আয়তন একরের বেশি।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বাংলাদেশ কার্যত: ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত?

খ. কী কারণে বাংলাদেশে ক্রমাগত জমির খণ্ডায়ন হচ্ছে?



পাঠ ১.৪ ভূমিস্বত্ব ও ভূমিসংস্কার

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বর্ণা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ভূমি সংস্কার বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পারবেন।



ভূমিস্বত্ব

কৃষি অর্থনীতিবিদ বিশপ ও টাওসেন্ট -এর ভাষায় ভূমিস্বত্ব বলতে ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব বা অধিকারকে বোঝায়। অন্য কথায়, ভূমির সাথে কৃষকের যে আইনগত ও প্রথাগত সম্পর্ক তা নির্ধারণ করে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা। প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় প্রধানত: তিন ধরনের কৃষক রয়েছে মালিক চাষী, মালিক-বর্ণাচাষী (আংশিক বর্ণাচাষী) এবং পূর্ণ বর্ণাচাষী। মালিক চাষী মালিকানা স্বত্বে নিজের জমি নিজেই আবাদ করতে পারে। বাংলাদেশে মালিক চাষীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৪০ হাজার। মালিকরা তাদের জমি নিজেরা আবাদ না করে অন্যকে বর্ণা দিয়ে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্ণাদার বর্ণাসূত্রে জমিটি আবাদ করে।

‘দায়শোধী’ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয়। ‘খায়খালসী’ এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়, যেমন ৫ বা ৭ বছরের জন্য নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয়।

অনেকে আবার উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে জমির মালিক না হয়েও বন্ধকী সূত্রে সাময়িকভাবে কোনো জমি ভোগ দখল করতে পারে। বন্ধকী ব্যবস্থা হতে পারে বিভিন্ন প্রকার। যেমন, ‘দায়শোধী’ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয় এবং যতদিন পর্যন্ত বন্ধকীর টাকা বন্ধকদাতা ফেরত না দিবে ততদিন বন্ধক গ্রহীতা জমিটি ভোগ করতে থাকে। এ ধরনের বন্ধককে অনেক স্থানে ‘ভোগরেহান’ বা ‘কটবন্ধক’ বলা হয়। আরেক ধরনের বন্ধকী ব্যবস্থার নাম ‘খায়খালসী’। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়, যেমন ৫ বা ৭ বছরের জন্য নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয় এবং বন্ধক গ্রহীতা ঐ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমিটি ভোগ দখল করার পর তা বন্ধক দাতাকে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত দেয়।

বর্ণা ব্যবস্থা

প্রায় সব দেশেই কৃষিতে কম বেশি বর্ণা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও কৃষি জমি আবাদের ক্ষেত্রে বর্ণা ব্যবস্থা প্রাধান্য: দুই প্রকার- নগদ বা চুক্তি বর্ণা ও ভাগচাষ বর্ণা। নগদ বা চুক্তি বর্ণা সাধারণত এক বছরের জন্য হয়। এ জন্য এ ব্যবস্থাকে অনেক স্থানে ‘সনকড়ালি’ বা ‘বছরচুক্তি’ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বর্ণা নিয়ে বর্ণাদার সারা বছর ইচ্ছামত যে কোনো ফসলের আবাদ করতে পারে।

কোনও কোনও অঞ্চলে বর্ণাদার সকল খরচ বহন করলে সে পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ও জমির মালিক পায় বাকী এক-তৃতীয়াংশ। এ ব্যবস্থাকে তেভাগা ব্যবস্থা বলা হয়।

অপর দিকে, ভাগচাষ বর্ণা ব্যবস্থায় বর্ণাদার সাধারণত ফসল উৎপাদনের পুরো খরচ বহন করে কিন্তু জমির মালিকের সাথে ফসল আধা আধি ভাগ করে নেয়। এ জন্য অনেক স্থানে এ ধরনের বর্ণা ব্যবস্থাকে ‘আখিয়া’ বলা হয়। তবে, যেসব অঞ্চলে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ শুরু হয়েছে সেখানে জমির মালিকরা বর্ণাদারকে সেচ, সার, বীজ ও কীটনাশকের অর্ধেক খরচ দেয়। কোনও কোনও অঞ্চলে বর্ণাদার সকল খরচ বহন করলে সে পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ও জমির মালিক পায় বাকী এক-তৃতীয়াংশ। এ ব্যবস্থাকে তেভাগা ব্যবস্থা বলা হয়।

১৯৮৩/৮৪ সালের কৃষি গুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ২ ভাগ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪২ হাজার পূর্ণ বর্ণাচাষী এবং শতকরা ৩৬ ভাগ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার আংশিক বর্ণাচাষী। এদেশে বর্ণাচাষীরা মোট জমির শতকরা ৪১ ভাগ আবাদ করে।

বর্ণা ব্যবস্থার দুটো ক্ষতিকর দিক রয়েছে : (ক) বর্ণাদার কত দিন পর্যন্ত জমি চাষ করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জমির মালিকরা ইচ্ছামত বর্ণাদারকে পরিবর্তন করতে পারে; এবং (খ) নিজস্ব জমির তুলনায় বর্ণাজমিতে উপকরণ কম ব্যবহার হয় বলে উৎপাদনও অনেক কম হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ইরি-বোরো ধান নিজের জমির তুলনায় বর্ণাজমিতে একর প্রতি প্রায় ৬ মণ করে কম হয়েছে এবং রোপা আমন কম হয়েছে ৩.৫ মণ করে।

ভূমি সংস্কার কী?

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে।

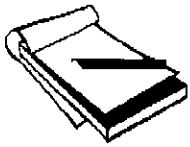
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে। ভূমি সংস্কার বলতে প্রধানত: বন্টনধর্মী ভূমি সংস্কারকে বোঝানো হয়। এর আওতায় আসে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ ও উদ্ধৃত্ত জমি যা সরকারের হাতে আসে তা এবং খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিতরণ করা। ভূমি সংস্কারের মধ্যে আরও পড়ে বর্ণাচাষের শর্ত পরিবর্তন করা, যাতে বর্ণাচাষীর উৎসাহ বাড়ে এবং তার ফলে বর্ণা জমির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি নিশ্চিতকরণ ও জমির খাজনা নির্ধারণও ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় পড়ে।

বাংলাদেশে ভূমিসংস্কারের অভিজ্ঞতা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। ১৯৫০ সনের পূর্ববাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদেরকে সরাসরি জমি ভোগ দখলের অধিকার দেয়া হয়। এরপর ১৯৬০ সনে ভূমিসংস্কার আইনে পরিবার প্রতি জমির সর্বোচ্চ সিলিং ৩৭৫ বিঘা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে জমির সর্বোচ্চ সিলিং আবার ১০০ বিঘায় নামানো হয়। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশে ১০০ বিঘার সিলিং বন্যা মুক্ত এলাকায় ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। তবে, কেউ যদি এই অধ্যাদেশ জারির আগে থেকেই ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক থেকে থাকে তার বেলায় এ সিলিং কার্যকর হবে না। এই হিসাবে মাত্র ৬ লাখ একরের মত উদ্ধৃত্ত জমি বন্টনের জন্য সরকারের হাতে আসার কথা। তবে, সঠিক কাগজপত্রের অভাব ও ভূমি প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বাস্তবে খুব কমই উদ্ধৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি বর্ণা সংস্কারের কোনো বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। মোট কথা, ভূমি সংস্কার কেবল কাগজেই আছে, বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

এ অধ্যাদেশে বর্ণাচাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদী চুক্তির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও তে-ভাগা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যাতে জমির মালিকানার জন্য ফসলের ১ ভাগ, বর্ণাদারের শ্রমের জন্য ১ ভাগ এবং উপকরণ যে সরবরাহ করবে তার জন্য ১ ভাগ থাকবে। কিন্তু, অদ্যাবধি বর্ণা সংস্কারের কোনো বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। মোট কথা, ভূমি সংস্কার কেবল কাগজেই আছে, বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।



অনুশীলন (Activity) : আপনার এলাকায় কী কী বর্ণা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা লিখুন। বর্ণা ব্যবস্থায় কে লাভবান হয়। বাংলাদেশে বর্ণাব্যবস্থায় গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : ভূমিস্বত্ব বলতে ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব বা অধিকারকে বোঝায়। জমির সাথে কৃষকের কী সম্পর্ক তাও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়। ভূমিস্বত্ব অনুযায়ী প্রধানত: তিন ধরনের কৃষক যেমন, মালিক চাষী, মালিক-বর্ণাচাষী ও বর্ণাচাষী রয়েছে। বর্ণা ব্যবস্থা দুই ধরনের হতে পারে, নগদ বা চুক্তি বর্ণা ও ভাগচাষ বর্ণা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলোর সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ভূমিস্বত্ব বলতে বোঝায়—

- ভূমির সাথে বর্গাচাষীর সম্পর্ক
- ভূমির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
- ভূমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক
- মালিকের সাথে বর্গাচাষীর সম্পর্ক।

খ. বর্গা ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক হচ্ছে—

- বর্গাদার গরীব এবং উপকরণের খরচ বহন করতে পারে না,
- বর্গাদারের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান নাই,
- বর্গাদার ইচ্ছামত জমি ব্যবহার করে জমির ক্ষতি করে,
- বর্গাজমিতে উৎপাদন কম হয়।

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়াকে দায়শোধী ব্যবস্থা বলে।

খ. তেভাগা পদ্ধতিতে জমির মালিক পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং কৃষক পায় বাকী এক-তৃতীয়াংশ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কারের অধ্যাদেশ অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করা হয়।

খ. ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলোর সমাধান কল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে বলে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বর্গা ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক কী?

খ. প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় কয় ধরনের কৃষক রয়েছে এবং কী কী?



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, পরিধি ও পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি কীভাবে অবদান রাখে তা আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশে জমির মালিকানা ও আবাদী জমির বন্টন আলোচনা করুন।
৪. খামার আয়তন ও খন্ডায়ন বলতে কী বোঝেন?
৫. ভূমি স্বত্ব বলতে কী বোঝেন?
৬. বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা কী?



উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

- | | |
|---|------------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iii |
| ২। ক. মি | ২। খ. স |
| ৩। ক. দুশ্রাপ্য | ৩। খ. প্রায়োগিক |
| ৪। ক. কৃষিখাতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধান করা | |
| ৪। খ. সম্পদের কাম্য ব্যবহার ও কৃষিপণ্যের কাম্য পরিমাণ | |

পাঠ ১.২

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. i |
| ২। ক. মি | ২। খ. স |
| ৩। ক. ১৮, ৫, ৪, ৩ | ৩। খ. শস্য, গবাদিপশু, মাৎস্য, বনায়ন |
| ৪। ক. পাট, তুলা, চামড়া, কাঠ | ৪। খ. মোট জনশক্তির ৬০% |

পাঠ ১.৩

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. i |
| ২। ক. স | ২। খ. মি |
| ৩। ক. ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার | ৩। খ. ২-৫, ২.৫-৭.৫, ৭.৫ |
| ৪। ক. ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার | ৪। খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে |

পাঠ ১.৪

- | | |
|--|--------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii |
| ২। ক. স | ২। খ. মি |
| ৩। ক. ১০০ বিঘা | ৩। খ. ভূমি সংস্কার |
| ৪। ক. বর্গা জমিতে উৎপাদন কম হয় | |
| ৪। খ. তিন ধরনের- মালিক চাষী, মালিক বর্গাচাষী, পূর্ণ বর্গাচাষী। | |

ইউনিট ২ উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনবিধি

ইউনিট ২ উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনবিধি

সম্পদ বা ভোগ্যদ্রব্যের উপযোগ রয়েছে বলেই এসবের চাহিদা সৃষ্টি হয়। আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে যে, সম্পদ কী? উপযোগ বলতে কি বুঝায়? প্রান্তিক উপযোগ কী? কেন চাহিদার সৃষ্টি হয়? মূল্য দ্বারা কীভাবে চাহিদা প্রভাবিত হয়? চাহিদা আছে বলেই পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট বিধির আওতাধীন। এই ইউনিটে এসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



পাঠ ২.১ উপযোগের সংজ্ঞা, ক্রমহাসমান উপযোগবিধি

এই পাঠ শেষে আপনি--

- উপযোগের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- উপযোগের ক্রমহাসমান প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রান্তিক উপযোগের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



যে সমস্ত দ্রব্য বা সেবা অর্থনীতির বিবেচনায় সম্পদ তার সরবরাহ সীমিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্য যার সরবরাহ অসীম তা সম্পদ নয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভাব মিটায় তা সম্পদ। সম্পদ ব্যবহারের উপযোগিতা থাকে।

যে কোনো দ্রব্য ব্যবহার বা সেবা উপভোগ করতে গিয়ে একজন ভোক্তা বা ব্যবহারকারী যে সন্তুষ্টি লাভ করে তাই হচ্ছে সে দ্রব্য বা সেবার উপযোগ। উপযোগ হলো তৃপ্তি মাত্রা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ব্যবহারের মোট উপযোগ অর্জন করতে গিয়ে ভোগকারী তা বিভিন্ন মাত্রায় অর্জন করতে পারে। ভোক্তা নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য বা সেবা যতই ভোগ করবে, তাতে মোট উপযোগ বাড়বে কিন্তু এক পর্যায়ে তা অবশ্যই প্রান্তিকভাবে কমতে থাকবে। মোট উপযোগ অর্জিত হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্যতায় নেমে আসবে। ক্ষুধার্তের নিকট আহার্য বস্তুর উপযোগ প্রথম দিকে অনেক বেশি। আহার গ্রহণ এগিয়ে গেলে ক্রমান্বয়ে উপযোগ কমতে থাকবে এবং মোট উপযোগ অর্জিত হলে আহার গ্রহণ বন্ধ করবে (প্রান্তিক উপযোগ সেই স্থলে শূন্য)। সাধারণ ভাবে মানুষের অভাব অসীম। উপযোগী দ্রব্য বা সম্পদের সরবরাহ সসীম। অসীম দ্রব্য বা সেবা একজন ভোক্তা যত বেশি ভোগ করতে থাকবে, ঐ দ্রব্যের অভাবের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। অর্থাৎ এক পর্যায়ে দ্রব্য ব্যবহারের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে থাকবে। প্রতিটি ব্যবহার পর্যায়ে ক্রমহাসমান উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। ভোক্তার ভোগের চাহিদা জৈব, প্রাকৃতিক কিংবা মানসিক ইত্যাদি কারণে হ্রাস পেয়ে থাকে।

মোট ও ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উদাহরণ

সারণি ২.১ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (উপযোগ সূচী)

দুগ্ধ পরিমাণ	মোট উপযোগ (মূল্যে)	প্রান্তিক উপযোগ (মূল্যে)
১ কেজি	২০ টাকা	২০ টাকা
২ কেজি	৩৬ টাকা	১৮ টাকা
৩ কেজি	৪৮ টাকা	১২ টাকা
৪ কেজি	৫৬ টাকা	৮ টাকা
৫ কেজি	৬০ টাকা	৪ টাকা
৬ কেজি	৬০ টাকা	০ টাকা

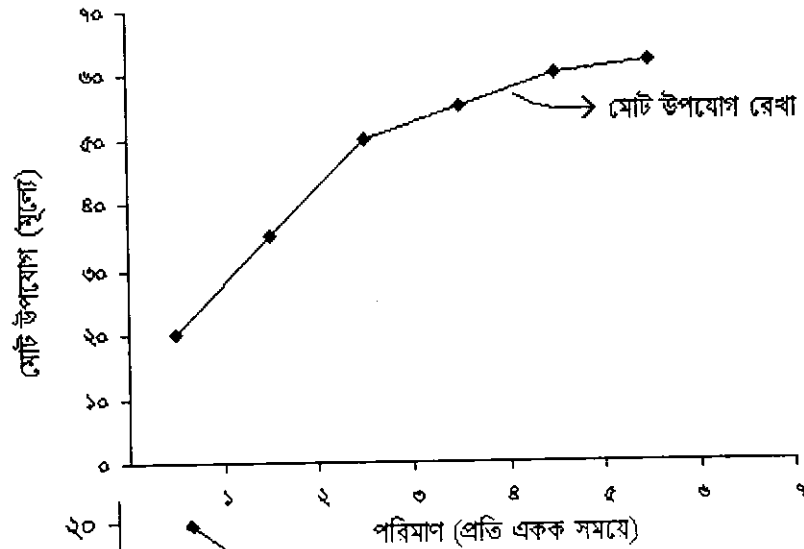
ভোক্তা নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য বা সেবা যতই ভোগ করবে, তাতে মোট উপযোগ বাড়বে কিন্তু এক পর্যায়ে তা অবশ্যই প্রান্তিকভাবে কমতে থাকবে।

যতই দুধ ক্রয়ের পরিমাণ ক্রেতা বাড়তে থাকবে ক্রমান্বয়ে তার অভাব কমতে থাকবে এবং দ্রব্য ক্রয়ের উপযোগিতাও কমতে থাকবে।

উপরের উপযোগসূচীতে দেখা যায় যে, একজন ভোক্তা প্রথম কেজি দুধ ক্রয়ে ২০ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। এই ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমান। দ্বিতীয় কেজি দুধ ক্রয়ে ক্রেতা কিছুটা অভাব কম অনুভব করতে পারে এবং সে কারনেই দ্রব্য ক্রয়ের প্রান্তিক উপযোগও কমে আসবে (যেমন দ্বিতীয় কেজি দুধ ক্রয়ের প্রান্তিক উপযোগ ১৮ টাকা) যতই দুধ ক্রয়ের পরিমাণ ক্রেতা বাড়তে থাকবে

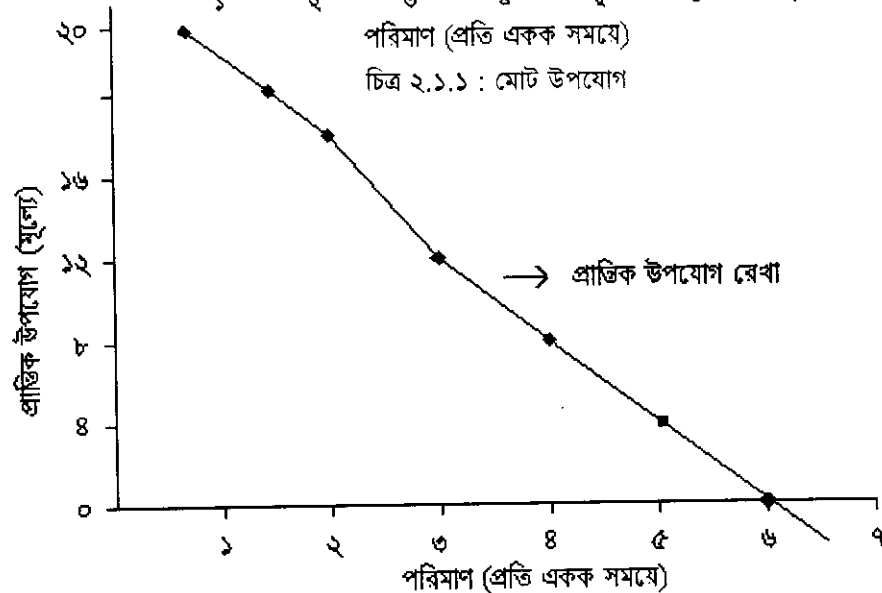
ক্রমান্বয়ে তার অভাব কমতে থাকবে এবং দ্রব্য ক্রয়ের উপযোগিতাও কমতে থাকবে। এই উপযোগ ক্রমের জন্য ক্রেতা প্রতি কেজি দ্রব্য ক্রমান্বয়ে কম দামে ক্রয় করতে চাইবে। উপযোগ শূন্যের নিচে হলে ক্রেতা ঐ দ্রব্য ক্রয়ে অনিচ্ছুক হবে।

কোনো দ্রব্যের দাম স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপাদন ও বিপণন খরচের নিচে বিক্রির জন্য আসার কথা নয়। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, প্রতিটি নতুন ক্রয়ে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। তবে ব্যতিক্রম হতে পারে যে, প্রথম এককের ক্রয় মোট চাহিদার যদি সামান্য হয়, তাহলে প্রথম দিকের ক্রয়ে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস না পেয়ে বাড়তেও পারে। যেমন- ক্ষুধার্তের আহার প্রথম দিকে অপরিপূর্ণ হলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বাড়তেও পারে। এমন একটা পর্যায় অবশ্যই আসবে যখন প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে শুরু করবে। উল্লিখিত উপযোগসূচীটি চিত্রের সাহায্যে নিচে প্রদর্শন করা হলো। উপরের সারণিতে প্রতিবার দুগুণ ক্রয়ের সংগে মোট উপযোগ টাকার পরিমাণ কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখানো হয়েছে। আর নিচের চিত্রে দ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধির সংগে প্রান্তিক উপযোগ প্রতিবারেই হ্রাস পাচ্ছে তা দেখানো হলো।



পরিমাণ (প্রতি একক সময়ে)

চিত্র ২.১.১ : মোট উপযোগ



পরিমাণ (প্রতি একক সময়ে)

চিত্র ২.১.২ প্রান্তিক উপযোগ

সারমর্ম : প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা যা মানুষের অভাব মেটাতে তাই সম্পদ। আর এই সম্পদ সবসময়ই সীমিত। অপর পক্ষে অভাব অসীম। কোনো ভোক্তা কোনো দ্রব্য ক্রমান্বয়ে ভোগ করার ফলে ক্রমান্বয়ে তার অভাব কমতে থাকবে এবং দ্রব্য ক্রয়ের উপযোগিতাও কমতে থাকবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. উপযোগ বলতে বুঝায়
- কোনো কিছু ক্রয় করা
 - কাউকে কিছু দান করা
 - কোনো দ্রব্যের ভোগ কিংবা ব্যবহারে ভোক্তা যে সন্তুষ্টি লাভ করে
 - সসীম দ্রব্য বা সেবা
- খ. একটা নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো দ্রব্য ভোগ করতে থাকলে উপযোগ হ্রাস পায় কেননা-
- দ্রব্যটির সরবরাহ অসীম
 - দ্রব্যটির সরবরাহ সসীম
 - দ্রব্যটি ক্রয় বা বিক্রয় করা যায়
 - ভোক্তার ভোগের চাহিদা জৈব, প্রাকৃতিক কিংবা মানসিক ইত্যাদি কারণে হ্রাস পেতে থাকে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. অর্থনীতির বিবেচনায় যা সম্পদ তার সরবরাহ।
- খ. মোট উপযোগ অর্জিত হলে প্রান্তিক উপযোগ নেমে আসবে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. কোনো দ্রব্যের উপযোগ শূন্যের নিচে হলে ক্রেতা ঐ দ্রব্য ক্রয়ে অনিচ্ছুক হবে।
- খ. কোনো পণ্যের প্রতিটি ব্যবহার পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

পাঠ ২.২ চাহিদার সংজ্ঞা, চাহিদা বিধি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, কৃষিপণ্যের চাহিদা



এই পাঠ শেষে আপনি--

- চাহিদার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাহিদার ক্রমহ্রাসমান বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষি পণ্যের চাহিদার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।



কোনো ভোক্তার কোনো দ্রব্যের জন্য সামর্থ্যপূর্ণ ক্রয়ের ইচ্ছাই হলো চাহিদা। নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা অন্যান্য বিষয়ে অপরিবর্তিত থেকে কোনো একটি দ্রব্যের দামের উঠা-নামার সংগে সেই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধিকে ঐ দ্রব্যটির চাহিদা সূচী বলে। সাধারণত কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ঐটির চাহিদা কমে এবং দাম কমে গেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটাকেই কোনো দ্রব্যের চাহিদা বিধি বলে। যে সকল দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে সেই সব দ্রব্যের প্রতিটির উপযোগও রয়েছে। একটা দ্রব্যের বর্তমান চাহিদা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে কিছু বিষয়ের উপর যেমন- (ক) দ্রব্যটির নিজস্ব দাম, (খ) ভোক্তার রুচি ও পছন্দ, (গ) ভোক্তার আয়, (ঘ) পরিবর্তক কিংবা দ্রব্যটির ব্যবহারে কাছাকাছি অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম এবং (ঙ) দ্রব্যটির ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা।

দ্রব্যের দামের উঠা-নামার সংগে চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত।

দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধি পেলে, বাজারে ঐ দ্রব্যটির চাহিদা কমে। দাম কমে গেলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ দ্রব্যের দামের উঠা-নামার সংগে চাহিদার সম্পর্ক সাধারণত বিপরীত। স্বল্প মেয়াদী সময়ে অন্যান্য বিষয়গুলো সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে। দীর্ঘ মেয়াদে (যেমন- কয়েকদিন, সপ্তাহ, একমাস, ছয়মাস কিংবা বছর) অন্যান্য বিষয় যেমন- ভোক্তার রুচি ও পছন্দ, ভোক্তার আয়, পরিবর্তক দ্রব্যাদির দাম কিংবা ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা একটি বা সবকটি পরিবর্তিত হতে পারে এবং চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

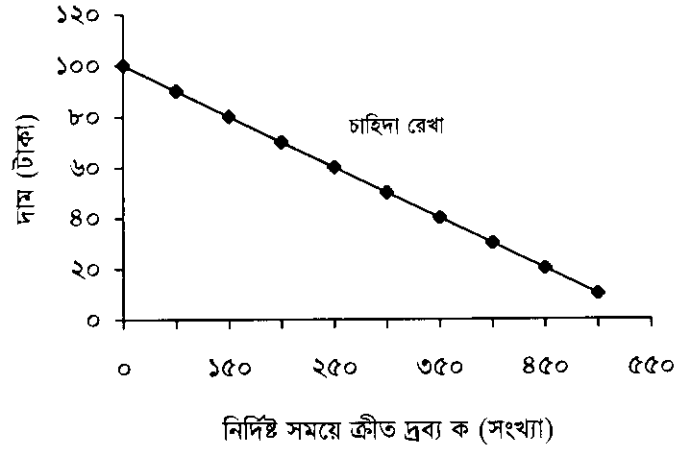
চাহিদাসূচী ও চাহিদা রেখা

একটি চাহিদাসূচী দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভোক্তার ক্রীত দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণকে প্রকাশ করে। নিম্নের সারণিতে কল্পিত একটি চাহিদাসূচী দেয়া হলো। 'ক' হলো একটি দ্রব্য, নির্দিষ্ট সময়ে দামের বিপরীতে 'ক' দ্রব্যের চাহিদা দেখানো হলো।

সারণি ২.২.১ দ্রব্য 'ক' এর চাহিদাসূচী

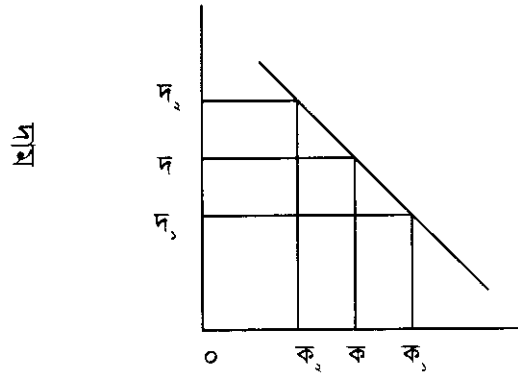
দাম (টাকা)	নির্দিষ্ট সময়ে ক্রীত দ্রব্য 'ক' (সংখ্যা)
১০০	০০০
৯০	১০০
৮০	১৫০
৭০	২০০
৬০	২৫০
৫০	৩০০
৪০	৩৫০
৩০	৪০০
২০	৪৫০
১০	৫০০

নিচে চাহিদাসূচীকে চিত্রে দেখানো হলো যা চাহিদা রেখার সৃষ্টি করেছে। উল্লম্বরেখায় দ্রব্যের দাম ও আনুভূমিক রেখায় দ্রব্যের সংখ্যা নির্দেশ করেছে।



চিত্র ২.২.১ চাহিদা রেখা

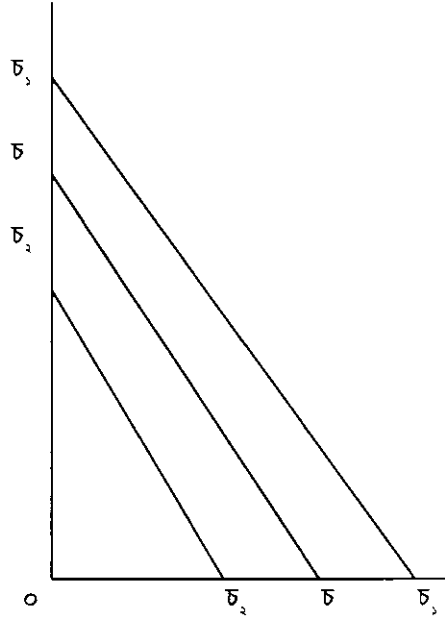
দাম ও চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক নিম্নমুখী চাহিদা রেখা ও ডানদিকে লম্বিত ঢালের সৃষ্টি করেছে। চাহিদা রেখা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ভোক্তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ক্রয়ের পরিমাণ দেখায়। চাহিদা রেখায় অথবা এর নিচে যেকোনো পরিমাণ দ্রব্য প্রদর্শিত দামে ভোক্তা ক্রয়ে সম্মত হতে পারে (চিত্র ২.২.২)। চাহিদা রেখাই চাহিদার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দেশক।



নির্দিষ্ট সময়ে ক্রীত দ্রব্য 'ক'

চিত্র ২.২.২ শুধু দামের পরিবর্তনে একই চাহিদা রেখায় দ্রব্যের পরিবর্তন

দাম বৃদ্ধি পেয়ে 'দ' থেকে 'দ' হলে দ্রব্য ক্রয় কমে 'ক' থেকে 'ক' হবে। তেমনি দাম কমে, যেমন 'দ' থেকে 'দ' হলে চাহিদা বেড়ে 'ক' থেকে 'ক' হবে। এটি হচ্ছে দামের উঠানামায় একই চাহিদা রেখায় দ্রব্যের পরিবর্তন।



চিত্র ২.২.৩ বিভিন্ন কারণে চাহিদা রেখার পরিবর্তন।

কোনো দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত না হয়েও বাজারে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বাড়তে পারে বা কমতে পারে।

কোনো দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত না হয়েও বাজারে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বাড়তে পারে বা কমতে পারে। ঋতু পরিবর্তনে কিংবা অন্য কোনো কারণে যেমন- ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, আয় বৃদ্ধি, কিংবা পরিবর্তক দ্রব্যের (গরুর মাংসের পরিবর্তক হতে পারে মাছ কিংবা খাসীর মাংস) দাম বৃদ্ধি পেলে কোনো দ্রব্যের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি উপর থেকে নিচে ডান দিকে সরে আসবে। কিংবা বিপরীতভাবে চাহিদা হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা বাম দিকে ভিতরমুখী সরে আসতে পারে (চিত্র ২.২.৩)।

চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা

অন্যান্য বিষয় স্থির থেকে মূল্যের এক শতাংশ পরিবর্তনে চাহিদা পরিমাণের যে শতাংশিক পরিবর্তন তাই ঐ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা।

চাহিদাসম্পন্ন একটি দ্রব্যের দামের উঠা-নামার সংগে ঐ দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ মূল্য উঠা-নামার পরিমাণের অনুপাত আপেক্ষিক বা শতাংশিক হারে প্রকাশকে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ অন্যান্য বিষয় স্থির থেকে মূল্যের এক শতাংশ পরিবর্তনে চাহিদা পরিমাণের যে শতাংশিক পরিবর্তন তাই ঐ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা। মূল্যের উঠা-নামার সংগে ঐ দ্রব্যের চাহিদার ঋণাত্মক (বিপরীতমুখী) সম্পর্ক থাকে বিধায় চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা সব সময় ঋণাত্মক। স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য থেকে অসীম (Infinity) হতে পারে। উপরে বর্ণিত স্থিতিস্থাপকতাকে সমীকরণে প্রকাশ করা যায় :

$$I_s = \frac{\frac{\Delta k}{k}}{\frac{\Delta d}{d}} = \frac{\Delta k}{\Delta d} \times \frac{d}{k} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{প্রাথমিক চাহিদা}}$$

যেখানে I_s = চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

Δk = দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন

Δd = দামের পরিবর্তন

d = প্রাথমিক দাম

k = প্রাথমিক চাহিদা

উদাহরণ : মনে করি একটি দ্রব্যের দাম ১০০ টাকা থেকে ৯০ টাকা হলো ফলে দ্রব্যটির চাহিদা ২৫০ কেজি থেকে ৩০০ কেজি হলো। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিম্নরূপে বের করা যায়-

দ্রব্যটির প্রাথমিক চাহিদা ২৫০ কেজি

চাহিদার পরিবর্তন = ৩০০ কেজি - ২৫০ কেজি = ৫০ কেজি

$$\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ } \Delta(k)}{\text{প্রাথমিক চাহিদা (ক)}} = \frac{৫০}{২৫০} = \frac{১}{৫}$$

$$\text{চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন} = \frac{৫০}{২৫০} \times ১০০ = ২০\%$$

প্রাথমিক দাম ১০০ টাকা

দামের পরিবর্তন = নতুন দাম - প্রাথমিক দাম = ৯০ - ১০০ = -১০

$$\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন} = \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক দাম}} = -\frac{১০}{১০০} = -\frac{১}{১০}$$

$$\text{দামের শতাংশিক পরিবর্তন} = \frac{-১}{১০} \times ১০০ = -১০\%$$

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}} = \frac{\frac{১}{৫}}{-\frac{১}{১০}} = -\frac{১০}{৫}$$

$$\text{অথবা (খ)} = \frac{\text{চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের শতাংশিক পরিবর্তন}} = -\frac{২০\%}{১০\%} = -২$$

(দ্রব্যের পরিমাপক কেজি কিংবা পাউন্ড যাই হোক, স্থিতিস্থাপকতার মান একই হবে কেননা হিসেবটি শতাংশিক হারে বা আনুপাতিক হারে ধরা হয়েছে।)

বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা, মূল্য পরিবর্তনে স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে, যেমন রঙিন টেলিভিশন।

অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের দামে শতকরা ১০ ভাগ কমলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। দ্রব্যটির চাহিদা মূল্য পরিবর্তনের হারের দ্বিগুণ। এক্ষেত্রে চাহিদা মূল্য পরিবর্তনে খুবই স্থিতিস্থাপক। বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা, মূল্য পরিবর্তনে স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে, যেমন রঙিন টেলিভিশন। স্থিতিস্থাপকতার মান যদি হত -১ তাহলে দামের ১০ ভাগ পরিবর্তন হলে চাহিদাও ১০ ভাগ পরিবর্তিত হত। এটাকে বলে একক স্থিতিস্থাপকতা। স্থিতিস্থাপকতার মান যদি -১ এর নিচে হয় (যেমন- ০.৭৫, -০.৫০ ইত্যাদি) তাহলে মূল্যের শতাংশিক পরিবর্তনের কম চাহিদার পরিবর্তন ঘটবে যা হলো মূল্য পরিবর্তনে অস্থিতিস্থাপক, যেমন- চাল, লবণ, কেরোসিনের মত অত্যাৱশ্যকীয় দ্রব্যাদি। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ হচ্ছে :

ক) একক স্থিতিস্থাপকতা ($E_d = -1$); মূল্য পরিবর্তনের হারের সমান চাহিদার পরিবর্তন হয়

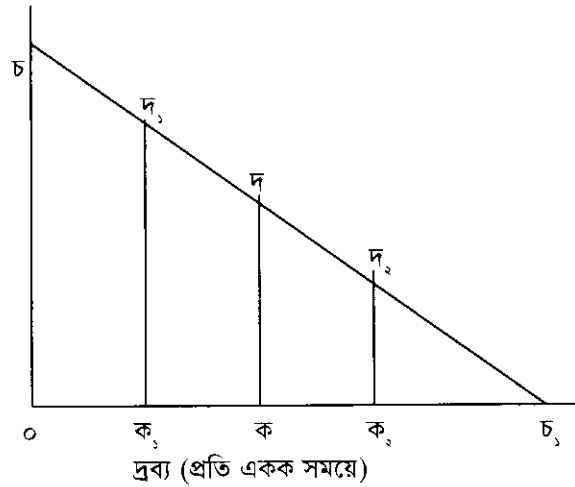
খ) স্থিতিস্থাপক চাহিদা ($E_d > -1$); চাহিদার পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের হারের বেশি

গ) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ($E_d < -1$); চাহিদার পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের হারের কম

ঘ) শূন্য স্থিতিস্থাপকতা ($E_d = 0$); মূল্য পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নেই

ঙ) অসীম স্থিতিস্থাপকতা ($E_d = \alpha$); নির্দিষ্ট মূল্যে চাহিদা অসীম

কোনো দ্রব্যের মূল্যের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ চাহিদা রেখার বিভিন্ন অংশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন। স্থিতিস্থাপকতার এসব প্রকারভেদ চাহিদারেখার চিত্রে দেখানো হলো :



চিত্র ২.২.৪ চাহিদারেখার বিভিন্ন স্তরে মূল্য স্থিতিস্থাপকতা

চ বিন্দুতে $\epsilon_c = \alpha$;

চ থেকে দ বিন্দুতে, $\epsilon_c > -1$

দ বিন্দুতে $\epsilon_c = -1$

দ থেকে C_s , $\epsilon_c < -1$

C_s বিন্দুতে $\epsilon_c = 0$

চাহিদা রেখার উপরের অংশে চাহিদা স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ দাম এক শতাংশ বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমে যাবে এক শতাংশের বেশি। চাহিদা রেখার মাঝামাঝি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা সমান অর্থাৎ দাম যে পরিমাণ (শতাংশে) বাড়বে ঠিক সেই পরিমাণ চাহিদা কমবে। কিংবা এর বিপরীতটাও হতে পারে। চাহিদা রেখার নিচের অংশে চাহিদা মূল্য অস্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ দাম যে হারে বাড়বে বা কমবে, দ্রব্যের চাহিদার উঠানামার হার হবে তার চেয়ে কম।

কৃষিপণ্যের চাহিদা

সাধারণভাবে কৃষি পণ্যের চাহিদা প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে, মূল্যবৃদ্ধিতে ঐ দ্রব্যে ভোক্তার মোট খরচের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং মূল্যহ্রাসে মোট খরচের পরিমাণ কমে যাবে।

জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনে কৃষিপণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। খাদ্য জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। অত্যাৱশ্যকীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ দাম যে হারে উঠানামা করবে, চাহিদার উঠানামা সে তুলনায় কম হবে। যেমন চালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। লবণের বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য নেই এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাই লবণের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। ডিম ও দুধের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। তরিতরকারীর বিকল্প বা পরিবর্তক শাক-সবজি রয়েছে বিধায় তুলনামূলকভাবে এসবের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। সাধারণভাবে কৃষিপণ্যের চাহিদা প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে অস্থিতিস্থাপক (স্থিতিস্থাপকতার মান -1 এর নিচে)। অল্প মূল্য পরিবর্তনে দ্রব্যের চাহিদার যদি বড় রকমের পরিবর্তন হয় (স্থিতিস্থাপক চাহিদা) তাহলে সেই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে মোট খরচ কমে যাবে (কেননা ক্রয় কমে যাবে অনেক বেশি) এবং মূল্যহ্রাসে ঐ দ্রব্যে মোট খরচ বৃদ্ধি পাবে। অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে, মূল্যবৃদ্ধিতে ঐ দ্রব্যে ভোক্তার মোট খরচের পরিমাণ বেড়ে যাবে (কেননা ক্রয়ের পরিমাণ খুব কমবে না) এবং মূল্যহ্রাসে মোট খরচের পরিমাণ কমে যাবে। অধিকাংশ কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার আয় ও চাহিদার ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে অধিক গুণগত দ্রব্যাদির চাহিদা বেশি বৃদ্ধি পায় (উদাহরণ- দুধ, ডিম, মাংস, ফল ইত্যাদি) এবং নিম্নগুণগত দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পায় (যেমন- মধ্যমমানের বা মোটা চালের চাহিদা কমে যায়)।



অনুশীলন (Activity) : গত এক বছরের ইউরিয়া সারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ ছিল? একটি আদর্শ মান ধরে তা বের করে দেখান।

সারমর্ম : অন্যান্য বিষয়ে অপরিবর্তিত থেকে কোনো একটি দ্রব্যের দামের উঠা-নামার সংগে সেই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধিকে ঐ দ্রব্যটির চাহিদা সূচী বলে। আর এই হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণকে যখন শতাংশিক হারে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে। বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। অত্যাৱশ্যকীয় এবং অপরিবর্তক দ্রব্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আর যেসব দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনে চাহিদার কোনো পরিবর্তন নেই সেক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা হবে শূন্য।



পাঠোত্তর মূল্যায়ণ ২.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাজারে দ্রব্য বা পণ্যের চাহিদা প্রভাবিত হয়--

- i. পরিবর্তক দ্রব্যের দামের উপর
- ii. যোগানের উপর
- iii. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর
- iv. দ্রব্য বা পণ্যের নিজস্ব দামের উপর

খ. চাহিদাসূচী বলতে বুঝায়--

- i. চাহিদানুযায়ী ক্রীত মোট দ্রব্য
- ii. যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা হবে তার তালিকা
- iii. দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভোক্তাদের ক্রীত বিভিন্ন পরিমাণ
- iv. বিক্রয়ের জন্য আনীত মোট দ্রব্য

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. দ্রব্যের দাম উঠা-নামার সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ক।

খ. একক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হলো।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

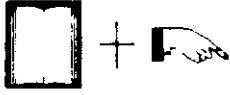
ক. চাহিদা রেখা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ভোক্তার সর্বোচ্চ ক্রয়ের পরিমাণ দেখায়।

খ. গম একটি অস্থিতিস্থাপকত পণ্য।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. চাহিদা বলতে কী বুঝায়?

খ. অসীম অস্থিতিস্থাপকতা কখন হবে?



পাঠ ২.৩ যোগান, যোগানবিধি, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং কৃষিপণ্যের যোগান এই পাঠ শেষে আপনি--

- যোগানের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যোগানের বিধি লিখতে ও বলতে পারবেন।
- যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষিপণ্যের যোগানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



দামের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে (অন্য সব অবস্থা যখন স্থির রয়েছে যেমন উপকরণের দাম কিংবা উৎপাদন কৌশল) বিক্রেতা বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যের যে সরবরাহ দিয়ে থাকে তাকেই ঐ দ্রব্যের যোগান বলে। যোগান হচ্ছে দাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য কোনো দ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানো বা কমানো। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যের দাম ও সরবরাহের সম্পর্কই যোগান। যোগানসূচী হচ্ছে বিভিন্ন দামের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সরবরাহের তালিকা। বিভিন্ন দাম ও সরবরাহকে যখন চিত্রে প্রদর্শন করা হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে। সাধারণভাবে দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় আবার দাম কমে গেলে যোগান কমে যায় (চিত্র ২.৩.১ক)। দাম ও যোগানের সম্পর্ক সরাসরি বা ধণাত্মক। এ কারণেই যোগান রেখা হবে নিচ থেকে উপরে ডান দিকে বা উপরের ডান দিক থেকে নিচের দিকে লম্বিত (চিত্র ২.৩.১খ দেখুন)। দামের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্য যোগানের যে সম্পর্ক তাই যোগানবিধি। যোগান বিধির মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বাড়বে এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান কমবে। যোগান হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা মৌজুতের অংশ। একারণেই মৌজুত পণ্য বাজারে যোগান নয়। একটি কল্পিত যোগানসূচী নিচের সারণিতে দেয়া হলো-

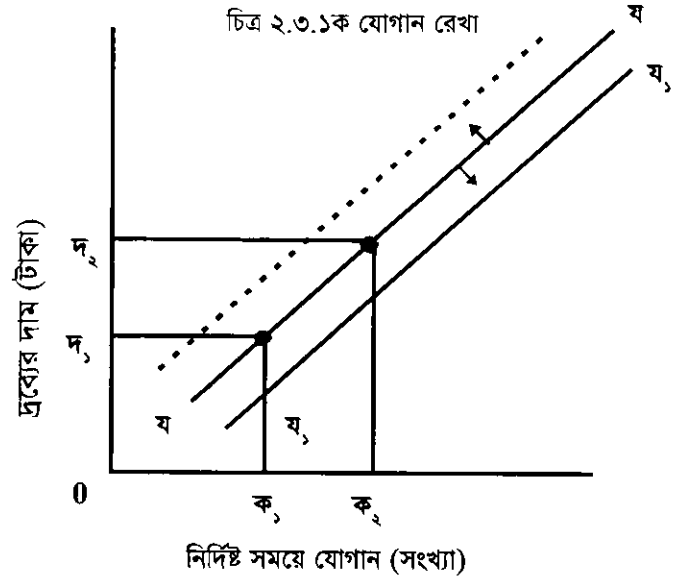
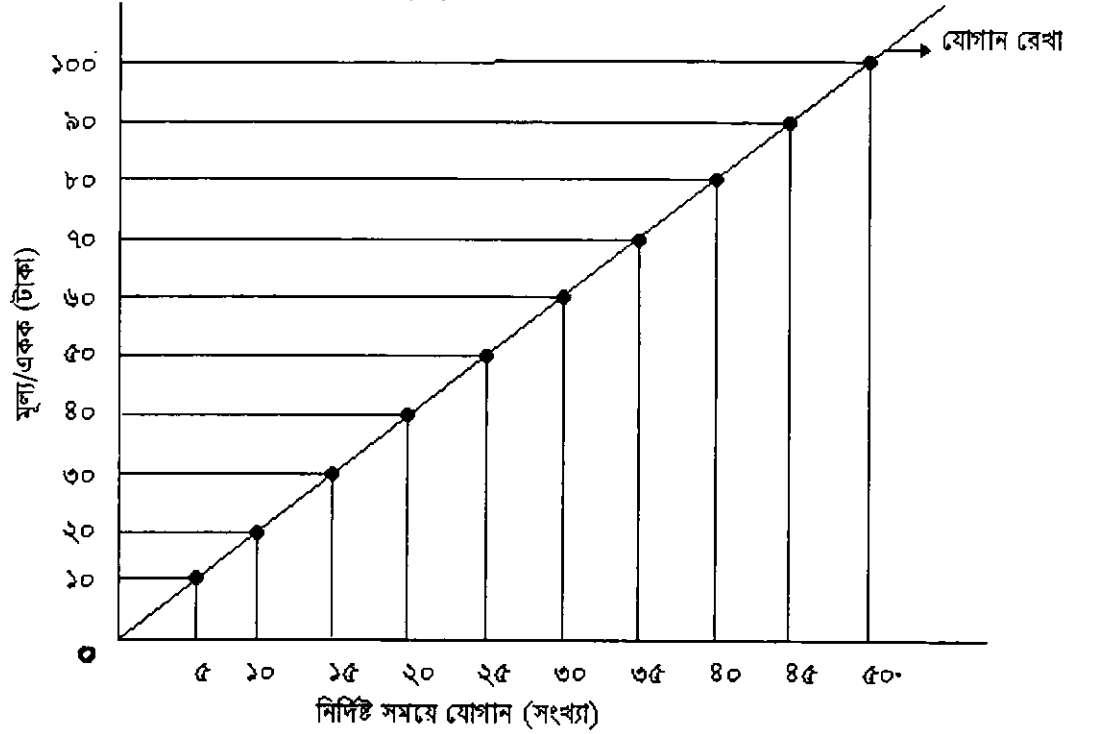
সারণি ২.৩.১ 'ক' দ্রব্যের যোগানসূচী

মূল্য/একক (টাকা)	নির্দিষ্ট সময়ে যোগান (সংখ্যা)
১০০	৫০
৯০	৪৫
৮০	৪০
৭০	৩৫
৬০	৩০
৫০	২৫
৪০	২০
৩০	১৫
২০	১০
১০	৫

কোনো একটি দ্রব্যের উৎপাদন উপকরণের দাম কমে গেলে দ্রব্যটির দামের পরিবর্তন না হলেও বাজারে মোট সরবরাহ বেড়ে যাবে।

যোগানরেখায় যে দাম দেখানো আছে (যেমন দাম ৭০ টাকা দ্রব্য ৩৫ টি) ঐ পরিমাণ দ্রব্য কিংবা তার কম বিক্রি করতে বিক্রেতারাজী থাকবে কিন্তু বেশি নয়। অর্থাৎ ৭০ টাকায় দ্রব্যের ৩৫টি দেবে ৩৬টি নয় (চিত্র ২.৩.১ক)। এর অর্থ হচ্ছে যদি দাম বৃদ্ধি না পায় তবে বিক্রেতা যোগানরেখার ডান দিকে কোনো দ্রব্য বিক্রি করবে না। দাম বাড়ার-কমার সংগে দ্রব্য যোগানের সম্পর্ক যোগানরেখা দ্বারাই প্রতিফলিত হবে। তবে দাম স্থির থেকে যোগানরেখাও ডান দিকে বা বাম দিকে সরে আসতে পারে। যেমন- কোনো একটি দ্রব্যের উৎপাদন উপকরণের দাম কমে গেলে দ্রব্যটির দামের পরিবর্তন না হলেও বাজারে মোট সরবরাহ বেড়ে যাবে (যোগানরেখা ডানদিকে সরে আসবে অর্থাৎ একই দামে যোগান বৃদ্ধি পাবে) কিংবা উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে এবং দ্রব্যটির দাম যদি স্থির থাকে

তাহলে যোগান কমে যাবে (যোগানরেখা বাম দিকে সরে আসবে চিত্র ২.৩.১খ, বিন্দু বিন্দুরেখা)।
উৎপাদন কৌশল উন্নত হলে দ্রব্যের দাম স্থির থাকলেও মোট যোগান বেড়ে যাবে (যোগানরেখা ডানদিকে সরে আসবে চিত্রে য_১-য_২ রেখা)।



চিত্র ২.৩.১খ যোগানরেখার পরিবর্তন

যোগান বিধির বাতিক্রমী অবস্থাও রয়েছে। যেমন- বিক্রেতার যদি ভবিষ্যতে আরো দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা দ্বারা চালিত হয়, তাহলে প্রথম বা দ্বিতীয় দফা দাম বৃদ্ধিতে যোগান নাও বাড়তে পারে। আবার ভবিষ্যতে দাম পড়ে যাবার সম্ভাবনা দ্বারা চালিত হলে তুলনামূলক কম দামেও সরবরাহ বেড়ে যেতে পারে। বন্দের অবরোধ, হরতাল, পূজা-পার্বণ কিংবা ঈদের পূর্বে ও পরে যোগানের এমন অবস্থা হতে পারে। মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের যোগান বাড়ার কথা, মজুরী উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধিজনিত কারণে শ্রমিক কম সময়ের জন্য কাজ করতে চাইতে পারে (এতে মোট শ্রমঘন্টা কমে যেতে পারে)।

দামের পরিবর্তনের সংগে দ্রব্যের যোগানে সাড়া দেওয়ার হারকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

স্বাভাবিক অবস্থায় দামের পরিবর্তনের সংগে যোগানের পরিবর্তন হয়ে থাকে। দামের পরিবর্তনে যোগানের সাড়া দেওয়ার মাত্রা একেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একেক রকম। দামের পরিবর্তনের সংগে দ্রব্যের যোগানে সাড়া দেওয়ার হারকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে যোগানের শতাংশিক পরিবর্তনের যে হার তাই স্থিতিস্থাপকতা। আবার এভাবেও বলা যায় যে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে, যোগানের ও দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত। নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হচ্ছে :

সমীকরণে প্রকাশ :

$$I_s = \frac{\frac{\Delta k}{\Delta d}}{\frac{d}{k}} = \frac{\Delta k}{\Delta d} \times \frac{d}{k} = \frac{\text{যোগানের পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{প্রাথমিক যোগান}}$$

যেখানে I_s = যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

Δk = দ্রব্যের যোগানের পরিবর্তন

Δd = দামের পরিবর্তন

d = প্রাথমিক দাম

k = প্রাথমিক যোগান

উদাহরণ : মনে করি একটি দ্রব্যের একক পরিমাপের দাম ৭০ টাকা থেকে ৮০ টাকা বৃদ্ধি পেল। ফলে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৪০ এ বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা (যোগানের মূল্য সাড়া) বের করা যায়--

ধরি, দ্রব্যটির প্রাথমিক যোগান ৩৫

যোগানের পরিবর্তন = ৪০ - ৩৫ = ৫

যোগানের আপেক্ষিক পরিবর্তন = $\frac{\text{যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{প্রাথমিক যোগান}} = \frac{৫}{৩৫} = \frac{১}{৭}$

যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন = $\frac{৫}{৩৫} \times ১০০ = ১৪.২৯\%$

প্রাথমিক দাম = ৭০ টাকা

দামের পরিবর্তন = নতুন দাম - প্রাথমিক দাম = ৮০ - ৭০ = ১০

দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন = $\frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক দাম}} = \frac{১০}{৭০} = \frac{১}{৭}$

দামের শতাংশিক পরিবর্তন = $\frac{১}{৭} \times ১০০ = ১৪.২৯\%$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (ক) = $\frac{\text{যোগানের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}} = \frac{\frac{১}{৭}}{\frac{১}{৭}} = ১$

অথবা (খ) = $\frac{\text{যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের শতাংশিক পরিবর্তন}} = \frac{১৪.২৯\%}{১৪.২৯\%} = ১$

মূল্যবৃদ্ধির শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন বেশি হয় তাহলে তাকে স্থিতিস্থাপক যোগান বলে।

যোগানের এই স্থিতিস্থাপকতার (একক স্থিতিস্থাপকতা) অর্থ হচ্ছে দ্রব্যের দাম যদি শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে যোগানও বৃদ্ধি পাবে ১৪ ভাগ। যোগানের এবং দামের পরিবর্তন সরাসরি বা ধনাত্মক। এখানে মূল্য বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণের সংগে যোগানের শতকরা বৃদ্ধির সমতা রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন বেশি হয় তাহলে তাকে স্থিতিস্থাপক যোগান বলে। যেমন- শতকরা ১৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধির ফলে মোট যোগান বৃদ্ধি পেল শতকরা ২০ ভাগ। এক্ষেত্রে যোগান স্থিতিস্থাপকতার মান ১ এর অধিক। আবার যোগান বৃদ্ধির শতকরা হার

মূল্য বৃদ্ধির শতাংশিক হারের চেয়ে কমও হতে পারে, যেমন- শতকরা ১৫ ভাগ মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে যোগান বৃদ্ধি পেল শতকরা ৫ ভাগ। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার মান ১ এর নিচে (যেমন, ০.৭৫ বা ০.৬০ ইত্যাদি)। স্থিতিস্থাপকতার মূল্য ০ থেকে α বা অসীম হতে পারে। শূন্য স্থিতিস্থাপকতার অর্থ, মূল্য যাই বৃদ্ধি হোক যোগান সীমাবদ্ধ, মূল্যের সংগে বাড়বে-কমবে না। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান। মৌসুমভিত্তিক পচনশীল কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়। তরমুজ মৌসুমে একবার উৎপাদিত হয়ে গেলে ঐ মৌসুমে দরদাম যাই থাক নির্দিষ্ট পরিমাণ সরবরাহ আসবেই। দামের পরিবর্তনহীনতা বা নির্দিষ্ট মূল্যে যোগান যদি অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ যোগান স্থিতিস্থাপকতা বলে। এক্ষেত্রে যোগান অসীম (বিরল ঘটনা)।

কৃষিপণ্যের যোগান

বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃষি কার্যক্রম প্রধানত পারিবারিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে পরিচালিত হয়ে থাকে।

কৃষিপণ্য উৎপাদন বহুলাংশে প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা, বৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে থাকে। বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃষি কার্যক্রম প্রধানত পারিবারিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কারণে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার অংশগ্রহণ করে। কৃষি উৎপাদন আত্মপোষণমূলক। কেবল বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। কৃষিপণ্যাদি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু থাকে বা রাখা হয় সেটাই বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত। কৃষিপণ্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত খামার আয়তন ও পরিবারের আকার অনুযায়ী বেশি কম হয়ে থাকে। তবে বড় খামার আয়তনের কৃষিপরিবারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উদ্ধৃত বেশি হয়ে থাকে। বাজারে কৃষিপণ্যের যোগান বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত থেকে এসে থাকে। তাছাড়া দৈব দূর্বিপাকে ঋণ শোধের মত জরুরী প্রয়োজনে কৃষিপরিবার প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকেও আপদকালীন (distress sale) পণ্য বিক্রয় করে থাকে যা পরবর্তী সময়ে সেই পরিবারকে পূরণায় ক্রয় করতে হয়। খাদ্য শস্যের যোগান এসে থাকে কৃষিপরিবারের বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত থেকে। কিছু কিছু পণ্য কৃষক পরিবার প্রধানত বাজারে বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন করে থাকে যেমন অর্থকরী ফসলসমূহ (উদাহরণ- পাট, তামাক, গোলআলু, মরিচ, শাকসবজি, ডালজাতীয় শস্য, তৈলবীজ ইত্যাদি)। আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ পরিবারের প্রয়োজন কেন্দ্রিক হলেও কৃষিপণ্যমূল্যের উঠানামার সংগে কৃষকগণ পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে-কমিয়ে সাড়া দিয়ে থাকে। চলতি বছরে যদি পাটের দাম ভালো যায়, দেখা যাবে পরের বছর পাটচাষে জমির পরিমাণ বেড়ে গেছে। আবার তেমনি দাম কমে গেলে পাট চাষ কমেও যেতে পারে। প্রায় সকল ফসলের জন্যই এটি সত্য। দাম ভালো পেলে কিংবা উৎপাদন বাড়ানো যায় এমন প্রযুক্তি (যেমন- ইরি ধান, সেচ, সার) সহজলভ্য হলে কৃষকগণ ঐসব ফসল ফলানোতে আগ্রহী হয়ে উঠে যা কৃষিপণ্য যোগানকে বাড়িয়ে দেয়। কৃষিপণ্যের দামের উল্লেখযোগ্য উঠানামার সংগে কৃষকগণ কৃষিপণ্যের যোগান বাড়িয়ে কমিয়ে থাকে। একই মৌসুমে ফলানো যায় এমন ফসল সমূহের মধ্যে যেগুলোর ফলনের অনিশ্চয়তা বেশি কৃষকগণ সেগুলো পরিহার করতে চায়।



অনুশীলন (Activity) : যোগান ও যোগান রেখা ব্যাখ্যা করুন। একটি কল্পিত যোগানসূচী তৈরি করে সেখানে যোগান রেখার প্রয়োগ দেখান।

সারসর্ম : যোগান হচ্ছে দাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য কোনো দ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানো বা কমানো। যোগান বিধির মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বাড়বে এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান কমবে। উৎপাদন কৌশল উন্নত হলে দ্রব্যের দাম স্থির থাকলেও মোট যোগান বেড়ে যাবে। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে, যোগানের ও দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাত। কৃষি ও পণ্যাদি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু থাকে বা রাখা হয় সেটাই বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত। খাদ্য শস্যের যোগান এসে থাকে কৃষিপরিবারের বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত থেকে। কৃষিপণ্যের দামের উল্লেখযোগ্য উঠানামার সংগে কৃষকগণ কৃষিপণ্যের যোগান বাড়িয়ে কমিয়ে থাকে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. যোগান বলতে কী বুঝায়?
- উৎপন্ন সকল দ্রব্য বা পণ্য
 - বাজারের অবিক্রিত সব পণ্য
 - বাজারে ভোক্তাদের ক্রীত মোট পণ্য
 - বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত সরবরাহ
- খ. অস্থিতিস্থাপক যোগান বলতে কী বুঝায়?
- দাম বৃদ্ধির চেয়ে যোগান বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি
 - দামের উঠানামার সংগে যোগান উঠানামা না করা
 - দাম ও যোগান একই হারে বৃদ্ধি না হওয়া
 - দ্রব্যের দাম এক শতাংশ বৃদ্ধি পেলে, যোগান এক শতাংশের কম বৃদ্ধি পাওয়া

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. কৃষিপণ্যের যোগান থেকে আসে।
- খ. যোগান হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা অংশ।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানও বৃদ্ধি পাবে।
- খ. অসীম যোগান স্থিতিস্থাপকতা একটি বিরল ঘটনা।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

- ক. কৃষিপণ্যের যোগান কীসের উপর নির্ভর করে?
- খ. কোন্ পণ্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক?



পাঠ ২.৪ উৎপাদন উপাদান, কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ

এই পাঠ শেষে আপনি--

- উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কী এবং এসবের বৈশিষ্ট্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কী ও তার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।



প্রকৃতি প্রদত্ত ভূমি কিংবা স্থল ব্যবহার করে নতুন দ্রব্যাদি বা সেবা সৃষ্টির প্রক্রিয়া হচ্ছে উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যিক যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত সকল উপাদানই উল্লিখিত চারটি উপকরণের কোনো না কোনোটিতে অন্তর্ভুক্ত। ফসল ফলাতে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হচ্ছে, ভূমি, বীজ, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের জন্য এ সমস্ত উপকরণ জড়ো করা এবং সময়মত ব্যবহারে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ (সংগঠন)। ফসল ফলাতে এ ছাড়াও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা, সূর্যালোক, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। এমন প্রকৃতি প্রদত্ত সকল উপাদানই অর্থনীতির সংজ্ঞামতে ভূমিতে অন্তর্ভুক্ত। বীজ ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি মূলধনী উপকরণ। মূলধনী উপকরণ ব্যবহৃত হয় শ্রম দ্বারা। উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবহারে সংগঠিত করার ভূমিকা যিনি রাখেন তিনিই উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনে সফল বা ব্যর্থ (লাভ/ক্ষতি) হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করেন। উৎপাদন উপকরণসমূহের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মানুষ ভূমি সৃষ্টি করতে পারে না।
ভূমির সমগ্রটাই প্রকৃতি প্রদত্ত।

১। ভূমি : সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে মৃত্তিকাকে বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন ভূমি বলতে চাষযোগ্য জমি, আলো-বাতাস, অরণ্য, জলাশয়, খনিজসম্পদ সহ প্রকৃতি প্রদত্ত উৎপাদন সহায়ক সকল উপাদানকেই বুঝায়। মানুষ ভূমি সৃষ্টি করতে পারেনা। ভূমির সমগ্রটাই প্রকৃতি প্রদত্ত। ভূমি উপকরণ ব্যবহারের জন্য যে খরচ দিতে হয় সেটা হলো খাজনা (rent)।

ভূমি উপকরণের বৈশিষ্ট্য

- ক) মানুষ ভূমি সৃষ্টি করতে পারেনা। একারণে কোনো উৎপাদন খরচ নেই। তবে ভূমির গুণাগুণ উন্নত করা যায়।
- খ) সামগ্রিক ভূমির সরবরাহ সীমিত। সেই জন্য ভূমির দাম যতই বাড়ুক বা কমুক মোট সরবরাহ কম-বেশি হবে না।
- গ) ভূমি স্থানাবদ্ধ একারণে ভূমির স্থানান্তর নেই।
- ঘ) ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ একারণে উৎপাদনকাজে বারবার এর ব্যবহারে ক্রমান্বয়ে এর প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়।

যে পরিশ্রম বা ক্রিয়ার ফলে
আর্থিক অর্জনের সুযোগ বা আর্থিক
সাশ্রয় হয় সেটাই অর্থনীতিতে শ্রম
হিসেবে বিবেচিত।

২। শ্রম : যে পরিশ্রম বা ক্রিয়ার ফলে আর্থিক অর্জনের সুযোগ বা আর্থিক সাশ্রয় হয় সেটাই অর্থনীতিতে শ্রম হিসেবে বিবেচিত। অর্থ অর্জন বা সাশ্রয়ের জন্য যে পরিশ্রম হয়না তা শ্রম নয়। যেমন- মনের সুখে গান গাওয়া বা আনন্দে ছবি আঁকা শ্রম নয়। আবার বড়শী দিয়ে মাছ ধরা শ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে কেননা তা আর্থিক অর্জন কিংবা অর্থ সাশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। অধ্যাপক মার্শালের মতে "মানসিক বা শারীরিক যে কোনো প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো উপকারের জন্যে করা হয় তাই শ্রম। শ্রমের জন্য যে খরচ সেটাকে বলে মজুরী (wage/salary)।

শ্রম উপকরণের বৈশিষ্ট্য

শ্রমিকের সরবরাহ কম থাকলে মজুরী বৃদ্ধি পাবে মজুরী বৃদ্ধি পেলে সাধারণত শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

- ক) শ্রম জীবন্ত উপকরণ, কেননা শ্রম প্রদানকারীর জীবন আছে। জীবনের অবসানে শ্রমের সমাপ্তি ঘটে। শ্রমের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার বয়স বিন্যাসের উপর। শিশু, অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধের সংখ্যা বেশি হলে জনসংখ্যা বেশি হয়েও শ্রমের যোগান কম হতে পারে। শ্রমের যোগান প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যথা জনসংখ্যা ও শ্রমের মজুরী। শ্রমিকের সরবরাহ কম থাকলে মজুরী বৃদ্ধি পাবে। মজুরী বৃদ্ধি পেলে সাধারণত শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাবে। অধিক মজুরী বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধির কারণে মোট শ্রমের যোগান কমে যেতে পারে।
- খ) শ্রমের গতিশীলতা আছে কেননা শ্রমজীবী কাজের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিংবা এক পেশা থেকে অন্য পেশায় যেতে পারে।
- গ) শ্রম এমন উপকরণ যা ব্যবহৃত না হলে চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যায়। একজন শ্রমিক একদিন কাজ না করলে সেটি চিরদিনের মতই হারিয়ে গেল বা নষ্ট হলো। অন্যদিন কাজ করা হলে সেটি সেদিনের শ্রমই হলো পেছনেরটা গেল হারিয়ে। কাজেই যথাসময়ে শ্রমের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শ্রমের দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে--

- শারীরিক যোগ্যতা ও জনগণের স্বাস্থ্যগত অবস্থা।
- শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।
- কর্মস্থলে কাজের পরিবেশ।
- পারিশ্রমিকের হার, চাকুরীর স্থায়িত্ব, উন্নতির সম্ভাবনা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা।
- প্রযুক্তিগত বা যান্ত্রিক প্রাণ্ড সুবিধা।
- সামাজিক বা যৌথ নিরাপত্তা বা কল্যাণ ব্যবস্থা (যেমন শ্রমিকের জন্য বীমা ব্যবস্থা বা ঋণ সুবিধা) কাজের প্রতি আন্তরিকতা বাড়ায়।

অর্থনীতিতে মূলধন হচ্ছে উৎপাদিত সেই সব দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতি যা পর্যায়েক্রমে নতুন উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩। মূলধন : অর্থনীতিতে মূলধন হচ্ছে উৎপাদিত সেই সব দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতি যা পর্যায়েক্রমে নতুন উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ও গবাদিপশু ইত্যাদি। কোনো কোনো মূলধন দ্রব্যাদি স্বল্প মেয়াদী থেকে দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হতে পারে। মূলধনের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একই সংগে উৎপাদিত দ্রব্য এবং আবার নতুন উৎপাদনের উপকরণও। মূলধন উদ্যোক্তা কর্তৃক সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। মূলধন শ্রমের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন- নিড়ানীতে ঘাস বাছাইয়ের পরিবর্তে উইডার (নিড়ানী যন্ত্র) ব্যবহার করা। মূলধনের পরিমাণ ও গুণাবলীর উপর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে। মূলধন উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে।

মূলধনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- ক) মূলধন হচ্ছে উদ্যোক্তার সঞ্চয়ের ফলশ্রুতি। উদ্যোক্তার আয়ের একাংশ ভোগে ব্যবহার না করে সঞ্চিত হলে তা নতুন উৎপাদনে মূলধনে রূপান্তরিত হতে পারে।
- খ) মূলধন সমজাতীয় নয়। যেমন- রাস্তাঘাট, ফ্ল্যাট, কলকারখানা, বীজ, সেচযন্ত্র একই স্থায়িত্ব ও গুণসম্পন্ন নয়।
- গ) মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। মানুষের শ্রম ও সম্পদ দ্বারা মূলধন সৃষ্টি হয়। মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৪। সংগঠন : ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আয়োজন, সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্যোগ হচ্ছে সংগঠন। সংগঠন উৎপাদনকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। যিনি সংগঠনের দায়িত্ব নেন তিনি হচ্ছেন উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা উৎপাদনে লাভ লোকসানের ঝুঁকি বহন করে। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের খরচ, যেমন- ভূমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরী ও মূলধনের সুদ উদ্যোক্তা বহন করে থাকেন। সংগঠন দক্ষতা কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে। সমস্ত উপকরণের খরচ বাদ দিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য থেকে যে অবশিষ্ট আয় থাকে তা উদ্যোক্তার প্রাপ্য মুনাফা। সংগঠন উপকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

সমস্ত উপকরণের খরচ বাদ দিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য থেকে যে অবশিষ্ট আয় থাকে তা উদ্যোক্তার প্রাপ্য মুনাফা।

উপকরণের চাহিদা পরস্পর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কেবল জমি থাকলেই হবে না, উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও পুঁজির সমাবেশ ঘটাতে হবে। জমির উৎপাদিকা নির্ভর করে শ্রম ও ব্যবহৃত মূলধনের উপর। তেমনি অন্যান্য উপকরণের সমাবেশ ছাড়া শ্রম অর্থহীন। মূলধনকে ব্যবহারের জন্য চাই ভূমি, শ্রম ও সংগঠন। উপকরণের এই পরস্পর নির্ভরশীলতার কারণে, উৎপন্ন দ্রব্য বা পণ্য নির্দিষ্ট উপকরণের একক অবদান বের করা কঠিন।

কৃষিতে প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ

ভোক্তার দ্রব্য বা পণ্য চাহিদাই মূলতঃ সকল উপকরণের চাহিদার সৃষ্টি করে।

দ্রব্য বা পণ্যের চাহিদার কারণেই উপকরণের চাহিদার সৃষ্টি হয়। চালের চাহিদার জন্যই উৎপাদন উপকরণ যেমন জমি, শ্রম কিংবা চাষের জন্য পুঁজির চাহিদা সৃষ্টি হয়। যতই চালের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, ধানের জমির চাহিদা এবং ধান চাষের উপযোগী শ্রমের চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাবে। ভোক্তার দ্রব্য বা পণ্য চাহিদাই মূলতঃ সকল উপকরণের চাহিদার সৃষ্টি করে। ভোক্তার চাহিদা আছে বলেই উদ্যোক্তা বা উৎপাদক উৎপাদনে অংশ নিয়ে উপকরণ চাহিদার সৃষ্টি করে। ভোক্তার দ্রব্য বা পণ্য চাহিদা থেকেই উপকরণ চাহিদার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণের পরস্পর নির্ভরশীলতা রয়েছে। তবে একটি উপকরণ স্থির রেখে, অন্য এক বা একাধিক উপকরণের ব্যবহার একগুন, দুইগুন বা তিনগুন বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন প্রথম দিকে প্রান্তিক ভাবে যে হারে বৃদ্ধি পাবে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি ব্যবহারে তা কমে আসবে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি বেশ লক্ষণীয়। কেননা কৃষি জমি সীমাবদ্ধ। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করে একই জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় এক সময়ে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এ ধারাটিকে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। অধ্যাপক মার্শাল উল্লেখ করেছেন যে, “জমিতে কৃষি কাজের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে সাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাতিক হার অপেক্ষা কম হবে।”

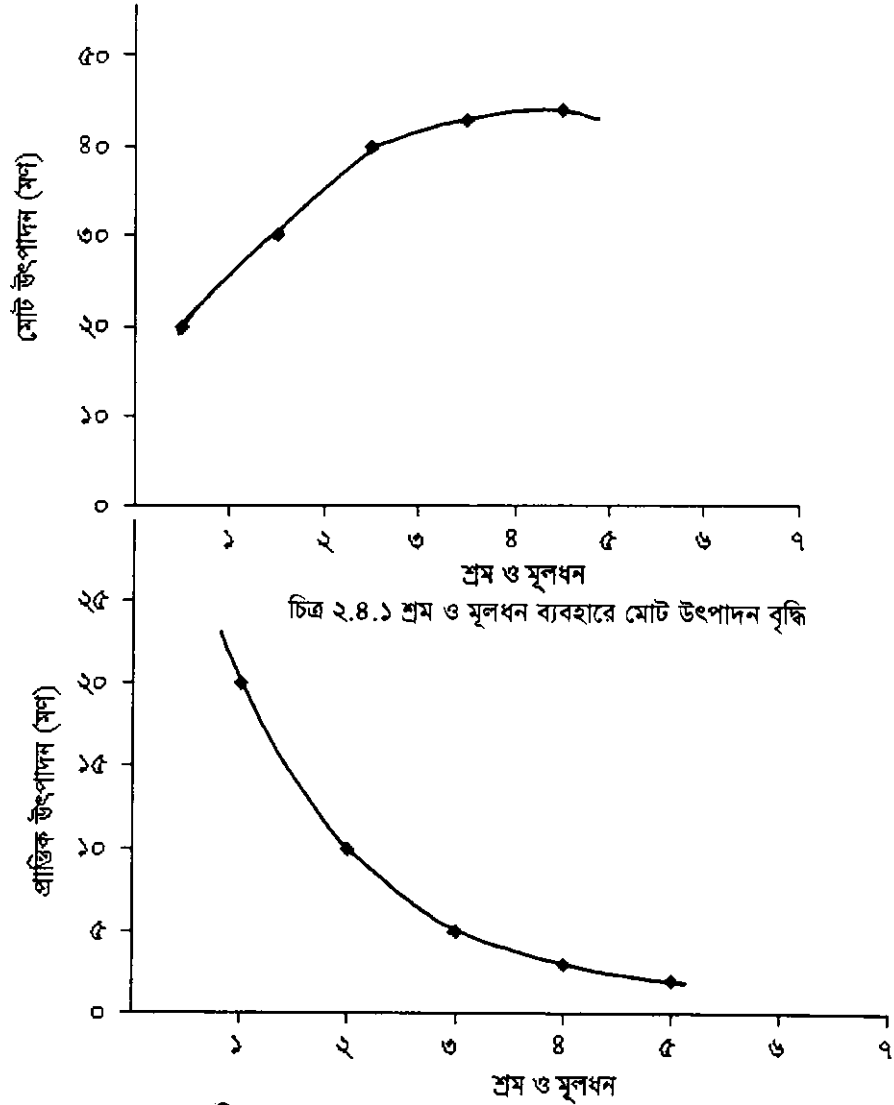
উদাহরণ : উৎপাদনের ক্রমহাসমান বিধি। এখানে জমির পরিমাণ স্থির হিসেবে এক একর ধরা হলো।

শ্রমিক/মূলধন একক	মোট উৎপাদন (মণ)	প্রান্তিক উৎপাদন (মণ)
১	২০	২০
২	৩০	১০
৩	৩৫	৫
৪	৩৮	৩
৫	৩৯	১

যে কোনো উৎপাদন উপকরণ স্থির রেখে অন্য এক বা একাধিক উপকরণ বাড়াতে থাকলে এ বিধিটি কার্যকর হবে।

উদাহরণে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট এক একর জমিতে শ্রম ও মূলধনের ব্যবহার যখন ১ একক তখন মোট উৎপাদন ২০ মণ। শ্রমিক ও মূলধনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তবে দ্বিগুণ নয় (৩০ মণ চিত্র ২.৪ ক)। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ১০ মণ (চিত্র ২.৪ খ)। শ্রমিক ও মূলধন একক যখন ৩ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে তখন প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ মণ। অর্থাৎ জমি স্থির রেখে শ্রম ও মূলধন উপকরণ যতই বৃদ্ধি করা যায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়েই কমে যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির এই ক্রমহাসমান নিয়মকে অর্থনীতিতে “ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি” বলে। শ্রমিক ও মূলধনের পরিমাণ স্থির রেখে উৎপাদনে জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকলেও ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হবে। অর্থাৎ যে কোনো উৎপাদন উপকরণ স্থির রেখে অন্য এক বা একাধিক উপকরণ বাড়াতে থাকলে এ বিধিটি কার্যকর হবে। তবে নতুন চাষাবাদের আওতায় আনা জমিতে অথবা চাষাধীন জমিতে বীজ, সার, সেচ ইত্যাদি (মূলধন) ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎপাদনের প্রান্তিক হার উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি হতে পারে। উপকরণ বৃদ্ধির পর্যায়ে কোনো এক সময়ে অবশ্যই ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হবে। প্রথম দিকে জমির তুলনায় নিয়োজিত শ্রম ও মূলধন কম হলে, প্রথম পর্যায়ে এসব উপকরণ বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হতে পারে তবে পরবর্তী কোনো এক পর্যায়ে বিধিটি কার্যকর হবে।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রান্তিক উৎপাদনবিধি দেখানো হলো।



অনুশীলন (Activity) : কৃষিতে ক্রমহাসমান উৎপাদন বিধির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : উৎপাদনের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যক যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে মৃত্তিকাকে বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। মূলধনী উপকরণ ব্যবহৃত হয় শ্রম দ্বারা। অর্থ অর্জন বা সাশ্রয়ের জন্য যে পরিশ্রম হয় না তা শ্রম নয়। শ্রমের জন্য যে খরচ সেটাকে বলে মজুরী। শ্রমের যোগান প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথা- জনসংখ্যা ও শ্রমের মজুরী। মূলধনের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একই সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্য এবং আবার নতুন উৎপাদনের উপকরণও। সংগঠন উৎপাদনকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। যিনি সংগঠনের দায়িত্ব নেন তিনি হচ্ছেন উদ্যোক্তা। দ্রব্য বা পণ্যের চাহিদার কারণেই উপকরণের চাহিদার সৃষ্টি হয়। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করে একই জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় এক সময়ে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এ ধারাটিকে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মূলধন বলতে বুঝায়-

- i. চাষাধীন জমি
- ii. সকল সম্পদ
- iii. ব্যাংকের সঞ্চয়
- iv. উৎপাদিত সেইসব দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতি যা নতুন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়

খ. উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধিটি বুঝায়--

- i. জমিতে উৎপাদন কমে যাওয়া
- ii. মূলধন কমে যাওয়া
- iii. জমির পরিমাণ স্থির রেখে শ্রম বা মূলধনের প্রতিবার ব্যবহারে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে আসা
- iv. সার ব্যবহার না করার ফলে উৎপাদন কমে যাওয়া

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মূলধন কর্তৃক সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয়।

খ. ভোক্তার দ্রব্যের বা পণ্যের চাহিদা থেকেই সৃষ্টি হয়।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

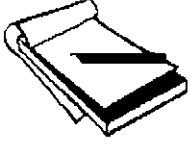
ক. ভূমি উপকরণ ব্যবহারের জন্য যে খরচ দিতে হয় সেটা হলো খাজনা।

খ. অধিক মজুরী বৃদ্ধির ফলে মোট শ্রমের যোগন বৃদ্ধি পায়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. উৎপাদন উপকরণ কয়টি ও কী কী?

খ. মজুরী কাকে বলে?



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সম্পদ কী বর্ণনা করুন ?
- ২। উপযোগ কী বিবৃত করুন ?
- ৩। সম্পদ ও উপযোগ কীভাবে সম্পর্কিত ?
- ৪। উপযোগের ক্রমহ্রাসমান বিধি কী ? কী কারণে এই ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকর হয়, ব্যাখ্যা করুন।
- ৫। চাহিদা বলতে কী বুঝায় বর্ণনা দিন। উদাহরণসহ চাহিদাসূচী ব্যাখ্যা করুন।
- ৬। যে বিষয় বা উপাদানগুলো চাহিদাকে প্রভাবিত করে সেগুলো লিখুন। চাহিদা রেখা পরিবর্তন আর চাহিদারেখা স্থানান্তর বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।
- ৭। চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা লিখুন। চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করুন।
- ৮। স্থিতিস্থাপক চাহিদা, একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কী বিবৃত করুন।
- ৯। স্থিতিস্থাপকতায় পার্থক্য হয় কেন, লিখুন। কৃষিপণ্যের চাহিদা কেন অস্থিতিস্থাপক তা বর্ণনা করুন। আয় বৃদ্ধির সংগে চাহিদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
- ১০। কৃষি পণ্য যোগানকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
- ১১। দাম স্থির থাকলেও যোগানরেখা ডান দিকে বা বাম দিকে সরে আসতে পারে কেন, বর্ণনা করুন।
- ১২। কৃষকগণ শস্য উৎপাদন বাড়ায় কমায় কেন, লিখুন।
- ১৩। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
- ১৪। উৎপাদনের উপকরণসমূহ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করুন।
- ১৫। ভূমি উপকরণের সংজ্ঞা লিখুন। এই উপকরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
- ১৬। শ্রম ও মূলধন উপকরণের পার্থক্য বিবৃত করুন।
- ১৭। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা বর্ণনা করুন।
- ১৮। সংগঠন উপকরণ বলতে কী বুঝায় বর্ণনা দিন। উদ্যোক্তার কাজ কী ব্যাখ্যা করুন।
- ১৯। উপকরণসমূহ উৎপাদন কার্যক্রমে পরস্পর নির্ভরশীল কেন তা ব্যাখ্যা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ২

পাঠ ২.১

- | | |
|-------------|-----------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. iv |
| ২। ক. সীমিত | ২। খ. শূন্যতায় |
| ৩। ক. স | ৩। খ. স |

পাঠ ২.২

- | | |
|--------------|-----------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iii |
| ২। ক. বিপরীত | ২। খ. -১ |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |
- ৪। ক. স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা
- ৪। খ. যখন নির্দিষ্ট মূল্যে চাহিদা অসীম হয়

পাঠ ২.৩

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. ii |
| ২। ক. বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত | ২। খ. মৌজুতের |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |
- ৪। ক. পণ্যদাম, প্রযুক্তি, বিরাজমান আবহাওয়ার ওপর
- ৪। খ. মৌসুমভিত্তিক পচনশীল কৃষিপণ্য

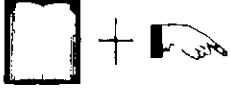
পাঠ ২.৪

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ১। ক. iv | ২। খ. iii |
| ২। ক. উদ্যোক্তা | ২। খ. উপকরণ চাহিদার |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |
- ৪। ক. চারটি; ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন
- ৪। খ. শ্রমের জন্য খরচকে।

ইউনিট ৩ বাজার ও কৃষিক্ষণ

ইউনিট ৩ বাজার ও কৃষিক্ষণ

পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মিলন ঘটায় বাজার। পণ্যের বাজার নির্দিষ্ট স্থান/এলাকা ভিত্তিক কিংবা বহুস্থানে বিস্তৃত হতে পারে। একই পণ্যের বাজার বহু স্থানে বিস্তৃত হলে পণ্যের চলাচল নিশ্চিত করে মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। পণ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রতিযোগিতার ধরন, ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাজার কাঠামো বা ধরন চিহ্নিত করা হয়। বাজার কাঠামোর উপর নির্ভর করে, পণ্যের দরদাম এবং ক্রেতা বা বিক্রেতা কতটুকু সুবিধা পাবে। বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। এই ইউনিটে বিভিন্ন পাঠে বাজার কাঠামোর বৈশিষ্ট্য, দাম নির্ধারণ, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে।



পাঠ ৩.১ বাজার ও বাজারের শ্রেণিবিভাগ

এ পাঠ শেষে আপনি--

- বাজার বলতে কী বোঝায় তা বিবৃত করতে পারবেন।
- বাজারে ভোক্তা ও উদ্যোক্তার ভূমিকা এবং বাজারের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজারের শ্রেণিবিভাগ এবং সেই সংগে ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



আপনি লক্ষ্য করুন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কত রকমের পণ্য বা দ্রব্যাদি ব্যবহার করছি। আপনি যে সাটটি ব্যবহার করছেন, তা হয়তো কোনো দোকান হতে ক্রয় করেছেন। সেটি ক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত তৈরি হয়ে দোকানে আসতে, উপকরণের সমাবেশ, উৎপাদন, বন্টন, পরিবহন, ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় দোকানে সমাবেশ, বিক্রয়, সব মিলিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিয়োজিত ছিল। এরকম লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা অসংখ্য ধরনের পণ্য ভোক্তার উপযোগী করে প্রতিনিয়ত তৈরি করছে এবং টাকার বিনিময়ে ভোক্তা তা ভোগ করছে। অর্থনীতিতে অসংখ্য পণ্য তৈরি ও ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম শৃঙ্খলার সংগে পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্রের কোনো রকম চাপ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই। উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ, অর্থনীতিতে এসব সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত এক অদৃশ্য প্রেরণায় যাকে ব্যক্তি স্বার্থ বলা হয়। এই ব্যক্তি স্বার্থের মূলে রয়েছে প্রত্যেক উৎপাদক বা উদ্যোক্তার মুনাফা অর্জন কিংবা ভোক্তার তৃপ্তি লাভের প্রেরণা। বাজার অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে এই অদৃশ্য ব্যক্তি স্বার্থ (মুনাফা অর্জন কিংবা তৃপ্তি লাভ)। ভোক্তার জন্য বাজার পণ্য সৃষ্টি করছে বিরামহীনভাবে সরকারের কোনো নির্দেশ ছাড়াই। পণ্য বা দ্রব্যাদি তৈরি করছে উৎপাদক বা উদ্যোক্তা শ্রেণী। সকল পণ্য উৎপন্ন করতে শ্রমের সরবরাহ দিচ্ছে ভোক্তাশ্রেণী যারা সবাই পরিবারভুক্ত (household) শ্রম বা উপকরণ সরবরাহ করে ভোক্তা কিংবা তার পরিবার যে আয় করে, উদ্যোক্তাদের (firms) উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারের মাধ্যমে ক্রয় করে তা ভোগ করে। উদ্যোক্তাশ্রেণী উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধনসহ যাবতীয় উপকরণের সমাবেশ ঘটায়। উৎপাদকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ সমূহ বাজারের মাধ্যমেই সংগ্রহ করে। তাহলে বাজারের মূল কাজ হলো বিনিময়ে (exchange) সহায়তা করা।

বাজার কী?

বাজার হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম।

সকল প্রকার উপকরণ, পণ্য, দ্রব্যসামগ্রী কিংবা সেবা বাজারের মাধ্যমে ভোক্তা বা উৎপাদকদের কাছে বিনিময় হয়ে থাকে। বিনিময়ে অংশ নিয়ে থাকে ক্রেতা ও বিক্রেতা শ্রেণী (এরাই ভোক্তা ও উৎপাদক)। বিনিময়ের জন্য প্রতিটি দ্রব্য, পণ্য কিংবা সেবার প্রকৃত মূল্য স্থিরকৃত হয় পণ্যের দামের মাধ্যমে। দ্রব্যের যা ব্যবহারমূল্য, দ্রব্যের দামে সেটার প্রতিফলন ঘটে। তাহলে বাজার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। বাজার হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম। বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি বিনিময়যোগ্য পণ্য বা সেবার বিনিময় দাম থাকবে। পণ্য বা সেবার দামই উৎপাদককে সংকেত দেবে

কোনো পণ্য বা দ্রব্য কতটুকু তৈরি করতে হবে। ভোক্তারা বেশি চাইলে পণ্যের দাম বাড়বে এবং এই দাম বৃদ্ধির সংকেতে উৎপাদক বেশি পরিমাণ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। আবার পণ্য বা দ্রব্যের দাম কমে গেলে এবং তা স্থায়ী হলে উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন কমিয়ে দেবে। আসলে পণ্য বা সেবার দামই ঠিক করে দেবে সেই পণ্য বা সেবা কতটুকু তৈরি হবে। দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য সৃষ্টি করে বাজার। আর চূড়ান্ত চাহিদা ও মোট সরবরাহ বাজারে পণ্যের দাম কী হবে তা নির্ধারণ করে।

বাজারের শ্রেণিবিন্যাস বা বাজার কাঠামো

বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা-মূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার।

ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা, দ্রব্যের যোগান পরিস্থিতি ও দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি নির্ভর করে বাজারের ধরন বা কাঠামো কী তার উপর। বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার। প্রতিটি বাজার ধরনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাজার কাঠামোর উপর নির্ভর করবে ক্রেতা পণ্য দামের দিক থেকে কতটা সুবিধা পাবে। নিম্নে প্রচলিত বাজার কাঠামোগুলো আলোচনা করা হলো।

ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক (Pure competition) বাজারের বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের পণ্য বাজারে থাকবে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা। এই শ্রেণীভুক্ত বাজারে পণ্য হবে সমজাতীয়। পণ্য সমজাতীয় (homogeneous) ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বিধায় কোনো একক বিক্রেতা দাম ইচ্ছে করলেও বাড়াতে পারবে না। দাম বাড়াতে চাইলে ক্রেতাগণ একই দ্রব্য অন্যত্র ক্রয় করবে (অসংখ্য বিক্রেতা)। বিক্রেতা দাম কমালে মুহূর্তেই তা শেষ হয়ে যাবে (বাজারে দাম বেশি পেলে যদিও কমে বিক্রি করার কথা নয়)। বহু কৃষিপণ্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে (যেমন- চিনি, একই আকৃতির গোলআলু, দুধ, ডিম ইত্যাদি)। ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মার্কেট পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এ ধরনের বাজারে ক্রেতা যেমন থাকবে অসংখ্য, যে কেউ সহজেই বিক্রয়েও অংশ নিতে পারে। মূল কথা হলো বাজারের ব্যাপকতার তুলনায় একজন ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রভাব ঐ পণ্যের দামের উপর হবে শূন্য। এই বাজার কাঠামোয় বিক্রেতার প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ এবং অন্য বিক্রেতাদের অলঙ্ঘ্যই ঘটে থাকে।

খ) প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গুণগত মান, আকার কিংবা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

এই ধরনের বাজারে থাকে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা (পূর্ণ প্রতিযোগিতার চেয়ে কম)। এই বাজারে পণ্যের গুণগত মান, আকার কিংবা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। পণ্য একেবারে সমজাতীয় নয়। যেমন চালের বাজার, ফলের বাজার, হোসিয়ারী দ্রব্য, জুতা, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বাজার। অর্থাৎ রং, স্বাদ, আকৃতি ও গুণগত মানে একই পণ্যের বিভিন্ন ব্রেন্ড বা পর্যায় রয়েছে। একই দ্রব্যের জন্য কোনো বিক্রেতা অন্য বিক্রেতার চেয়ে দাম বেশি দাবী করতে পারে দ্রব্যের গুণগত মানে পার্থক্য আছে এই যুক্তিতে। একই বাজারে অনেক বিক্রেতা ও মানের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি দ্রব্যের যোগান থাকার কারণে- বিক্রেতা দাম নির্ধারণে খানিকটা বা অল্প স্বল্প প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং অনেক বিক্রেতার কারণে দামের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সমঝোতাও সম্ভব নয়। এই বাজারে একক কোনো ক্রেতার প্রভাবও হবে অনুল্লেখ্য। এই ধরনের বাজারেও বিক্রেতার প্রবেশ সহজ।

গ) একচেটিয়া কারবারী বাজার (Monopoly market)

যে বাজারে শুধু একজন বিক্রেতা এক বা একাধিক দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করে যার কাছাকাছি কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই, তা হচ্ছে একচেটিয়া কারবারী বাজার। এটা সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একটি ফার্ম বা উদ্যোক্তার একক নিয়ন্ত্রণে সমুদয় বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়। বিক্রিত দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা থাকতে পারে অনেক। উদাহরণ তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কর্তৃপক্ষ। এ বাজারে অন্য বিক্রেতার প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব কেননা দ্রব্য বা সেবা সৃষ্টিতে উৎপাদন ও সংগঠন ব্যয় অত্যধিক। একচেটিয়া কারবারী এককভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে থাকে। সমগ্র বাজারে যদি শুধুমাত্র দুইজন বিক্রেতা থাকে, তাহলে তাকে দ্বৈত কারবারী বাজার বলে।

সমজাতীয় পণ্যে মুষ্টিমেয় কারবারী
বাজারে ফার্মগুলো মূল্য ও
বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে
সমঝোতায় এসে একচেটিয়া
কারবারীর ভূমিকায় নামতে পারে

ঘ) মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার (Oligopoly market)

এই বাজার ব্যবস্থাতে মুষ্টিমেয় (একের অধিক তবে সাত-আট জন বিক্রেতার বেশি নয়) দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। ক্রেতা থাকতে পারে অনেক। মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার হতে পারে (ক) সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত অথবা (খ) প্রায় কাছাকাছি মানসম্পন্ন একই দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত। এই জাতীয় বাজার ব্যবস্থায় একজন উদ্যোক্তা বা ফার্মের দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ অন্য ফার্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমজাতীয় পণ্যে মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে (উদাহরণ- ওপেকের OPEC প্রেট্রোলিয়াম বাজার) ফার্মগুলো মূল্য ও বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সমঝোতায় এসে একচেটিয়া কারবারীর ভূমিকায় নামতে পারে। অবশ্য সমঝোতা কঠিন হয়ে পড়ে কেননা প্রতিটি ফার্ম অধিক পরিমাণ বিক্রি করতে চাইতে পারে, কাজেই সমঝোতা ভেঙ্গে গোপনে দাম কমানোর প্রবণতা দেখা যায়। স্টেট প্রকৃতিত হয়ে পড়লে ফার্মগুলোর মধ্যে মূল্যযুদ্ধ লেগে যেতে পারে অর্থাৎ কে কতো কমবে বা কমিশন দেবে মুষ্টিমেয় কারবারী সমজাতীয় পণ্য বাজারে এ প্রবণতা সতত বিদ্যমান। একটি উদাহরণ যেমন- জেল থেকে রাজধানীমুখী গেইটলক বাস সার্ভিসে, কে কত ভাড়া নিচ্ছে স্টেট লক্ষ্য রাখছে। প্রায় কাছাকাছি মান সম্পন্ন পণ্য নিয়ে মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে (যেমন- লজ্জী সাবান, সেলুলার ফোন কোম্পানী, জুতা কোম্পানীসমূহ, সিমেন্ট শিল্প, কারুশিল্প বাজার) প্রতিটি ফার্ম নিজস্ব পণ্য যশ ও মানের কিছুটা ভারতম্যে অথবা ক্রেতাদের বিবেচনায় অধিক মানসম্পন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় দামে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ বাজারে নতুন উদ্যোক্তার প্রবেশ সহজ নয়, কেননা উৎপাদনে যেতে প্রচুর পুঁজি, দক্ষ জনশক্তি ও বাজার দখলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

অনুশীলন (Activity) : আমাদের দেশের প্রচলিত বাজার কাঠামোগুলোর ওপর আলোচনা করুন।

সারমর্ম : বাজার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার। এই ধরনের পণ্য বাজারে থাকবে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা। এই শ্রেণীভুক্ত বাজারে পণ্য হবে সমজাতীয়। পণ্য সমজাতীয় (homogeneous) ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বিধায় কোনো একক বিক্রেতা দাম ইচ্ছে করলেও বাড়াতে পারবে না। এই বাজার কাঠামোয় বিক্রেতার প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ এবং অন্য বিক্রেতাদের অলক্ষ্যেই ঘটে থাকে। এই ধরনের বাজারে থাকে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা। পণ্য একেবারে সমজাতীয় নয়। এই ধরনের বাজারেও বিক্রেতার প্রবেশ সহজ। যে বাজারে শুধু একজন বিক্রেতা এক বা একধিক দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করে যার কাছাকাছি কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই, তা হচ্ছে একচেটিয়া কারবারী বাজার। এটা সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার। সমগ্র বাজারে যদি শুধুমাত্র দুইজন বিক্রেতা থাকে, তাহলে তাকে দ্বৈত কারবারী বাজার বলে। এই বাজার ব্যবস্থাতে মুষ্টিমেয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। এই বাজারে নতুন উদ্যোক্তার প্রবেশ সহজ নয়, কেননা উৎপাদনে যেতে প্রচুর পুঁজি, দক্ষ জনশক্তি ও বাজার দখলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাজার কাঠামো চিহ্নিত করা হয়-

- ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা, পণ্যের গুণাবলী ও প্রতিযোগিতার ধরন দ্বারা
- বাজার গ্রাম এলাকায় না শহর এলাকায় তা দেখে
- বাজারে শুধু ক্রেতার সংখ্যা কত তা দ্বারা
- বাজারে শুধু বিক্রেতার সংখ্যা কত এর উপর

খ. অর্থনীতিতে অসংখ্য পণ্য তৈরি ও ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত এক অদৃশ্য প্রেরণায়, কারণ--

- সরকারের রয়েছে পুলিশবাহিনী
- রাষ্ট্রে রয়েছে বিচার বিভাগ
- প্রত্যেক নাগরিক আসলে সুনাগরিক
- উৎপাদকের মুনাফা অর্জনের ব্যক্তি স্বার্থে অদৃশ্য প্রেরণা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. বাজারের মূল কাজ হলো সহায়তা করা।
- খ. ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মার্কেট একটি বাজার।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. উৎপাদক কোনো পণ্য কতটুকু উৎপাদন করবে তা শ্রমিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে।
- খ. একচেটিয়া বাজার একটি সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার।



পাঠ ৩.২ বাজারে দাম নির্ধারণ

এই পাঠ শেষে আপনি--

- বাজারের কাঠামো অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজারের কাঠামো অনুযায়ী বিক্রেতা যে চাহিদা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন বাজার কাঠামোতে উৎপাদক ও ভোক্তার কল্যাণ বেশি-কম তা বিবৃত করতে পারবেন।



ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নিরূপণ

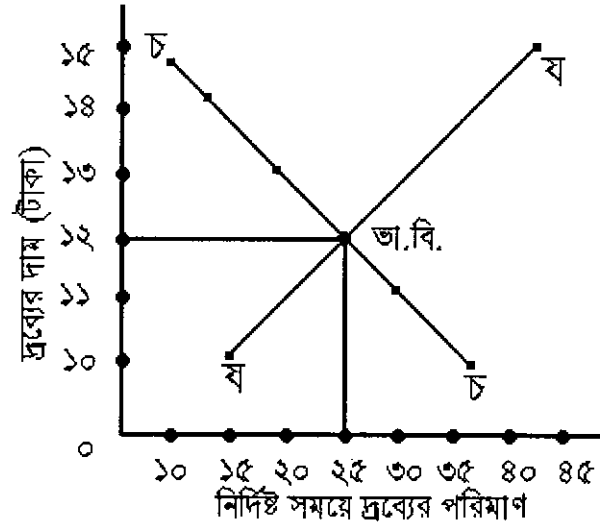
চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে বাজারের দ্রব্য বা পণ্যের বিক্রয় দাম নির্ধারিত হয়। বাজারের মোট চাহিদা যদি মোট যোগানের চেয়ে বেশি হয় তবে দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে। দাম বৃদ্ধির ফলে বিক্রেতার যোগান বাড়তে থাকে এবং যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকলে আবার দাম কমে যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সমতায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এইভাবে নির্ধারিত দামই ভারসাম্য মূল্য। বিষয়টি নিম্নে সারণি ও চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো।

সারণি ৩.২.১ : দাম পরিবর্তনে মোট চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতি

দ্রব্যের দাম (টাকা) (ডজন ডিম)	মোট চাহিদা (ডজন ডিম)	মোট যোগান (ডজন ডিম)
১৫	১০	৪০
১৪	১৫	৩৫
১৩	২০	৩০
১২	২৫	২৫
১১	৩০	২০
১০	৩৫	১৫

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, বাজারে প্রতি ডজন ডিম যখন ১৫ টাকা, তখন ঐ বাজারে মোট চাহিদা ১০ ডজন এবং মোট যোগান ৪০ ডজন (চিত্র ৩.২.১ লক্ষ্য করুন)। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকায় ডিমের দাম কমে আসবে। দাম কমার সংগে ক্রমান্বয়ে মোট যোগানও কমে আসবে। যখন প্রতি ডজন ডিম ১২ টাকা তখন মোট চাহিদা ও মোট যোগান সমান অর্থাৎ ২৫ ডজন (চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু)। বাজারে ১২ টাকা হচ্ছে ভারসাম্য মূল্য। কোনো কারণে দাম পড়ে ১১ টাকা হলে মোট চাহিদা বাড়বে তবে ঐ কম দামে যোগান কমে যাবে (যোগান হবে ২০ ডজন)। চাহিদার তুলনায় বাজার যোগান কম হওয়ায় দাম বেড়ে চাহিদা ভারসাম্য বিন্দুতে স্থির হবে। ভারসাম্য দাম স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ সরবরাহ ও চাহিদা স্থির থাকবে। আবহাওয়া কিংবা মৌসুমের পরিবর্তন ও আয়ের কম বৃদ্ধির কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটতে পারে। উৎপাদনে কমবেশি হলে, সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে যোগান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান কমে যাবার ফলে মূল্য বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হবে এবং তা পুনরায় যোগান ও চাহিদার সমতা অবস্থায় দামকে নিয়ে যাবে। এভাবেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যমূল্য ভারসাম্য অবস্থায় স্থিতিশীল হবে। নিম্নে রেখা চিত্রের সাহায্যে দ্রব্যের দাম নির্ধারণের বিষয়টি দেখানো হলো-

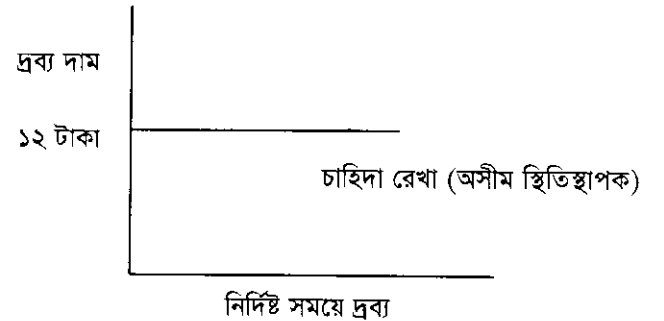
ভারসাম্য দাম স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ সরবরাহ ও চাহিদা স্থির থাকবে।



চিত্র ৩.২.১ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ও ভারসাম্য দাম

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা বাজার নির্ধারিত দামেই বিক্রয়ে বাধ্য।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা বাজার নির্ধারিত দামেই বিক্রয়ে বাধ্য। একজন বিক্রেতার নিকট দাম বেশি হলে ক্রেতারাই ঐ দামেই বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ে সক্ষম (পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য)। একজন বিক্রেতা কোনো কারণে দাম কমালে মূহুর্তেই তা শেষ হয়ে যাবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতা যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তা নিচে রেখা চিত্রে দেখানো হলো।



চিত্র ৩.২.২ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদারেখা

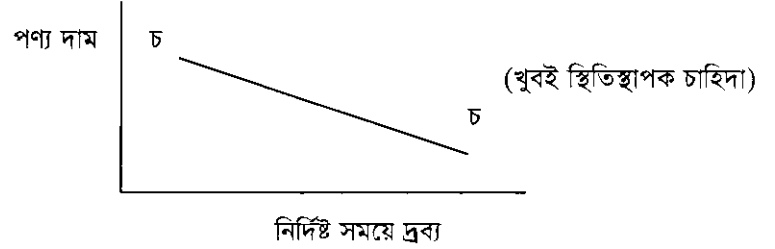
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান রেখা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় বিধায় এটিই হবে ভোক্তার জন্য সর্বনিম্ন দাম।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় একটি পণ্যের এক দাম। বাজারে যে দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে সকল ক্রেতা-বিক্রেতা তা অবগত থাকবে। একজন বিক্রেতা একদামে যত ইচ্ছে সে বিক্রয় করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান রেখা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় বিধায় এটিই হবে ভোক্তার জন্য সর্বনিম্ন দাম। অসংখ্য বিক্রেতা এই বাজারে অংশ নিতে পারে এবং উৎপাদন কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা সর্বোচ্চ বিধায় নিম্নতম খরচে পণ্য উৎপাদনে বাধ্য হয় (না হয় উৎপাদন বা যোগান দেয়া একজন উদ্যোক্তাকে বন্ধ করে দিতে হবে)। সে কারণে এ বাজার ব্যবস্থা সামাজিক অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা দেয় এবং অধিক পণ্য উৎপাদন, সর্বনিম্ন পণ্য দাম নিশ্চিত করে বিধায় সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ নিহিত থাকে। এই বাজার কাঠামোতে অসংখ্য বিক্রেতার কারণে প্রত্যেকের মুনাফা থাকবে সর্বনিম্ন।

একটা দ্রব্য আরেকটির খুব নিকট পরিবর্তক, সেই কারণে দামের পার্থক্য খুব বেশি হবে না।

খ) প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া

এই ধরনের বাজার কাঠামোতে অনেক ক্রেতার বিপরীতে থাকে অনেক বিক্রেতা যারা বিভিন্ন মান, স্বাদ, রং কিংবা আকারের একই পণ্য বিক্রি করে। পণ্যের এই পার্থক্যের কারণে এখানে বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় একই পণ্যের দামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। একটা দ্রব্য আরেকটির খুব নিকট পরিবর্তক, সেই কারণে দামের পার্থক্য খুব বেশি হবে না। এখানে বিক্রেতা বাজারে খুবই স্থিতিস্থাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পণ্য বিক্রয় করবে। নিম্নে প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা রেখা দেখানো হলো।



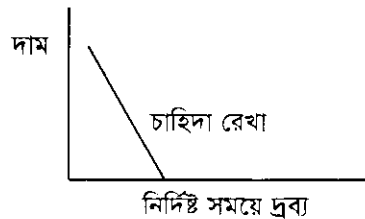
চিত্র ৩.২.৩ প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখা

কোনো কোনো পণ্য বিক্রেতা দামে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিধায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার চেয়ে দাম এখানে কিছুটা বেশি হবে যদিও দাম নির্ণীত হবে বাজারের মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। একই পণ্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন দাম বিরাজ করবে।

গ) একচেটিয়া কারবারী বাজার

একজন বিক্রেতাই সমস্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। দ্রব্যটির এমন বৈশিষ্ট্য যে এটির কাছাকাছি বিকল্প নেই। এ ধরনের বাজার কাঠামোর উদাহরণ খুবই কম। এটা এমন সব দ্রব্য বা সেবা যা কতিপয় কিংবা বেশ কিছু ফার্ম উৎপাদন করলে কারো জন্যই লাভজনক হয়না। এমন পরিস্থিতি একচেটিয়া কারবারের জন্ম দেয়। একচেটিয়া কারবারী দাম এককভাবে নির্ধারণ করলেও এতবেশি করে না যে ভবিষ্যতে আরো বেশি ফার্মের জন্ম হতে পারে, অন্যের দ্বারা বিদেশ থেকে আমদানী হতে পারে বা ভোক্তা শ্রেণী ব্যাপক প্রতিরোধী হয়ে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। একচেটিয়া কারবারী দাম নিয়ন্ত্রণ করলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি করতে পারেনা যা ভোক্তা প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা ভবিষ্যতে বিকল্প উৎসের সৃষ্টি হবে। তবুও একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যমূল্য অন্য যে কোনো বাজার কাঠামোর চেয়ে বেশি হয়। দ্রব্য উৎপাদনের প্রান্তিক আয়ের চেয়ে দ্রব্যমূল্য বেশি হবে যেখানে চাহিদা রেখা উপর থেকে নিম্নতালমুখী। নিম্নে একচেটিয়া কারবারী যে বাজার চাহিদা রেখার মোকাবেলা করে তা দেখানো হলো। চাহিদা রেখা সকল বাজার কাঠামোর চেয়ে অস্থিতিস্থাপক। দ্বৈত কারবারী বাজার পণ্যের সমতার কারণে সাধারণত মিলিতভাবেই পণ্যদাম ঠিক করে থাকে। এক্ষেত্রে সকল বৈশিষ্ট্যই একচেটিয়া কারবারী বাজারের মত।

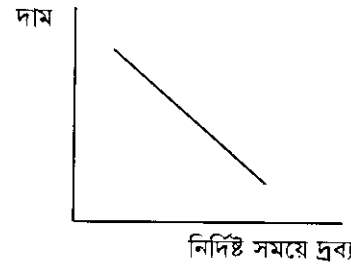
তবুও একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যমূল্য অন্য যে কোনো বাজার কাঠামোর চেয়ে বেশি হয়।



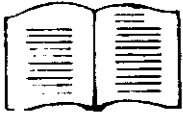
চিত্র ৩.২.৪ একচেটিয়া কারবারীর জন্য বাজার চাহিদা রেখা

ঘ) মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার

এই বাজার কাঠামোতে যেহেতু কতিপয় ফার্ম বা উদ্যোক্তা সকল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাই প্রতিটি ফার্ম মূল্য নির্ধারণ বা পরিবর্তনে অন্য ফার্মগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। একটি ফার্ম দাম কমালে অন্যরা সংগে সংগেই তা অনুসরণ করবে। সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবায় কেউ এককভাবে দাম বাড়াতে চায়না। সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কারবারী যদি জোটবদ্ধ হয় তবে এরা একচেটিয়া কারবারীর মতই মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা নিতে পারে। তবে যেখানে দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে ভোক্তা কর্তৃক পার্থক্য বিবেচিত হয় (differentiated oligopoly) সেক্ষেত্রে অধিকতর চাহিদার প্রেক্ষাপটে কোনো ফার্ম দাম নেতৃত্ব গ্রহণ করে কিছুটা দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে থাকে। খুব কাছাকাছি বিকল্প থাকায় অধিক দাম বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই বাজার কাঠামোতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার জন্য আকর্ষণীয় মোড়ক, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, লটারী কূপণ, দ্রব্যের নতুন সংস্করণ ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবু দ্রব্য উন্নতকারী বা বৈচিত্র্যপূর্ণ করণের প্রচেষ্টা এই বাজার কাঠামোতে লক্ষ্য করা যায়। এই বাজার কাঠামোতে বৃহৎ ফার্মগুলোর মধ্যে বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতাই এর কারণ। ফার্মগুলো একচেটিয়া কারবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক, কিন্তু প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার কাঠামোর চেয়ে কম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা মোকাবেলা করে থাকে।



চিত্র ৩.২.৫ মুষ্টিমেয় কারবারীর বাজার চাহিদা রেখা



অনুশীলন (Activity) : বিভিন্ন প্রকার বাজারে কীভাবে দাম নির্ধারিত হয় তা বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সমতায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান কমে যাবার ফলে মূল্য বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হবে এবং তা পুনরায় যোগান ও চাহিদার সমতা অবস্থায় দামকে নিয়ে যাবে। এটা এমন সব দ্রব্য বা সেবা যা কতিপয় কিংবা বেশ কিছু ফার্ম উৎপাদন করলে কারো জন্যই লাভজনক হয়না। এমন পরিস্থিতি একচেটিয়া কারবারের জন্য দেয়। সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবায় কেউ এককভাবে দাম বাড়াতে চায়না। সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কারবারী যদি জোটবদ্ধ হয় তবে এরা একচেটিয়া কারবারীর মতই মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা নিতে পারে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\sqrt{\quad}$) দিন।

- ক. প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোতে পণ্যের দাম--
- বিক্রেতার সম্মিলিতভাবে পণ্যের দাম ঠিক করে থাকে
 - ক্রেতার মিলিতভাবে দাম ঠিক করে থাকে
 - পণ্যের মান অনুযায়ী বিক্রেতার ভিন্ন ভিন্ন দাম চাইতে পারে
 - ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত কোনো একটা দামে রাজি হয়
- খ. মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে সমজাতীয় পণ্য হলে বিক্রেতার--
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত পণ্য দাম নির্ধারণ করে
 - প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত দাম নির্ধারিত হয়
 - যে যার মত দাম নির্ধারণ করে
 - একচেটিয়া কারবারী বাজারের মত পণ্য দাম নির্ধারিত হয়

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় একটি পণ্যের দাম।
- খ. একচেটিয়া বাজারে একজন সমস্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় মোট চাহিদা ও সরবরাহের উপর।
- খ. প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বা দ্রব্য সরবরাহ কতিপয় ফার্ম বা উদ্যোক্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।



পাঠ ৩.৩ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ও সমস্যাসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি--

- পণ্য বিপণন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- চিহ্নিত সমস্যা অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



কৃষিপণ্য উৎপাদকবৃন্দ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করেন জীবন নির্বাহ প্রয়োজনে, আর অংশত বাড়তি পণ্য বাজারে বিক্রির মাধ্যমে নগদ টাকায় প্রয়োজন মিটান। কৃষকের আয় মূলতঃ নির্ভর করে কৃষিপণ্য বিক্রয়ে লভ্য দর দামের উপর। ভোক্তাদের পর্যায়ে খুচরা বিক্রয়ে পণ্যের যে দাম থাকে, কৃষকের খামারের দোরগোড়ায় সেই দামের কত অংশ পাবে তা মূলতঃ নির্ভর করে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে কতটি মধ্যসত্ত্বভোগী এবং দু'বাটি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় (যেমন- গম থেকে পাউরুটি) অন্যান্য উপকরণের সমাবেশ খরচ কতটুকু। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে নানা হাত/স্তর পার হতে হয়। যেমন- বাছাই করা, বাজারে জড়ো করা, বাজার থেকে কিছু অংশ সরাসরি ভোক্তা নিতে পারে, বাকী অংশ যায় বেপারী ও ফড়িয়াদের হাতে দূরের ভোক্তাদের জন্য। বেপারী ও ফড়িয়া পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে আড়তে বা পাইকারী বিক্রেতার নিকট। আড়ত বা পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে তা বিক্রয় এলাকার খুচরা বিক্রেতার কাছে (তিরিতরকারী, মাছ বা ডিমের কথা ভাবুন) চলে যায়। ধান হলে আড়ত বা পাইকার থেকে, কিংবা ফড়িয়া থেকে চালে রূপান্তরের জন্য চালকলে যায়। সেই চাল পাইকারী বিক্রেতা পৌঁছে দেবে খুচরা বিক্রেতার কাছে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য। খামারের দোরগোড়া থেকে সাধারণ ভোক্তার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া। এই বিপণন ব্যবস্থা উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর ধাপ পণ্য থেকে পণ্যে ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাজারজাতকরণের সমুদয় খরচই হচ্ছে বিপণন খরচ। বাজারে আনয়ন, মজুরী, পরিবহন, দোকানভাড়া, টোল প্রদান, অপচয় এসবই বিপণন খরচের অন্তর্ভুক্ত। বিপণনের ধাপ যত বেশি হবে (যেমন কৃষক থেকে ফড়িয়া একধাপ, ফড়িয়া থেকে আড়ত আরেক ধাপ) বিপণন খরচ ততবেশী হবে। বিপণন খরচ বেশি হলে কৃষক ভোক্তার দেয় দামের অনেক কম পাবে। যেমন- ভোক্তার দেয় ১০০ টাকার চালে কৃষক পায় গড়ে ৭৪ টাকা, ২৬ টাকা হলো বিপণন খরচ। আবার কোনো কোনো পণ্যের ভোক্তার প্রদত্ত মূল্যের ৫৫-৬০ ভাগ পায় মাত্র কৃষক। অর্থাৎ বিপণন খরচ বেশি। বিপণন প্রক্রিয়া দক্ষ হলে সাধারণত বিপণন খরচ কম হয়ে থাকে এবং কৃষক লাভবান হয়। বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা উৎপাদকের নিকট পৌঁছে।

বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের উপযোগ বৃদ্ধি করে থাকে। এই উপযোগ বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়। বিপণনের মাধ্যমে প্রধানতঃ স্থানগত, রূপান্তরগত এবং সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

বিপণন ব্যবস্থা চাহিদা সম্পন্ন স্থানে পণ্য পৌঁছে দেয়ায় পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

পণ্যের স্থানগত উপযোগ : পণ্য যেখানে উৎপাদিত হয় সেখানে পূর্ণ চাহিদা নাও থাকতে পারে, যেমন- খামারে উৎপাদিত মোরগ-মুরগী কিংবা ডিম, উৎপাদিত তরমুজ, তিরিতরকারী, রাজশাহীর আম। যেখানে প্রবল চাহিদা (যেমন- শহুরে এলাকা) সেখানে এসব উৎপন্ন হয় না। বিপণন ব্যবস্থা চাহিদা সম্পন্ন স্থানে পণ্য পৌঁছে দেয়ায় পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এই স্থানগত উপযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে ক্ষুদে ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, বেপারী, মহাজন বা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। বাজার ব্যবস্থায় এরা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যসত্ত্বভোগী বা বিপণন কারক।

রূপান্তরগত উপযোগ : উৎপাদিত পণ্য যে অবস্থায় থাকে রূপান্তরের মাধ্যমে সেই সব পণ্যের আরো উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফল থেকে যখন ফলের রস বোতলজাত করা হয়, সেটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং বিভিন্ন ভোক্তার কাছে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তেমনি দুধ থেকে দই, ক্ষীর, মিষ্টি তৈরি রূপান্তরগত উপযোগ সৃষ্টি করে মূল পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। রূপান্তরগত পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পণ্যের পর্যায়িতকরণ, আকার অনুসারে বিন্যাস কিংবা প্যাকেটে পরিবেশন রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উপযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রয়াস।

কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় মৌসুমভিত্তিক কিন্তু চাহিদা ব্যাপ্ত থাকতে পারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কিংবা সারা বছর।

সময়গত উপযোগ : কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় মৌসুমভিত্তিক কিন্তু চাহিদা ব্যাপ্ত থাকতে পারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কিংবা সারা বছর। এ কারণে উৎপাদনকাল থেকে ভোগকাল পর্যন্ত পণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মৌসুমে উৎপন্ন পণ্য শুধুমাত্র ঐ মৌসুমেই ভোগ করতে হলে অধিক যোগানের কারণে পণ্যমূল্য হতে পারতো অতিশয় নিম্নমুখী। বিপণন ব্যবস্থায় মজুতদার, পাইকার কিংবা গুদামের মালিকেরা পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। পণ্যের সংরক্ষণগত প্রযুক্তি উন্নততর হলে সময়গত উপযোগ বৃদ্ধি পাবে।

কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা

কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। অসংখ্য ছোট ছোট খামার উৎপাদন কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। কৃষকগণ প্রতিটি মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। মূলতঃ এক একজন কৃষকের বিক্রয়যোগ্য উৎপাদের পরিমাণও থাকে কম। কাজেই সুসংগঠিত বিপণন কার্যক্রমে উৎপাদক কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। গ্রাম্য বা প্রাথমিক বাজারে অল্পসংখ্যক জোটবদ্ধ ফড়িয়া, ব্যাপারীর নিকট কৃষকের পণ্য বিক্রয় করতে হয় বিধায় উৎপাদক কৃষককে কখনো কখনো পণ্যের কম দাম মেনে নিতে হয়। গ্রাম্য রাস্তাঘাট কাঁচা কিংবা উন্নত না হওয়ায় দ্রব্যের পরিবহন ব্যয় সাপেক্ষ হয়, তদুপরি পরিবহনে বিলম্বজনিত কারণে পণ্য অপচয় কিংবা পচনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বাজার থেকে বাজারে পণ্য স্থানান্তর ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। কৃষিপণ্য তুলনামূলকভাবে ভারী ও পচনশীল হওয়ায় সংরক্ষণ ব্যয় বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে যে বছর পণ্য উৎপাদন সকলের জন্যই ভালো হয় বা বৃদ্ধি পায় সে বছর দাম পড়ে যায়।

অঞ্চলে অঞ্চলে ওজন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। এই ওজনের হেরফেরেও উৎপাদক কৃষক পণ্য বিক্রয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকে। কৃষকগণ বিক্রির সময়ে পণ্যের আকার, রং, আকৃতি অনুযায়ী বিন্যাস না করেই বিক্রি করে দেয় বলে গড় দাম কম পায়। গ্রাম্য বা মাধ্যমিক বাজারে প্রবঞ্চনা, অতিরিক্ত টোল আদায়, ওজনে বেশি বা কম মাপা বা ক্রেতা-বিক্রেতার দ্বন্দ্ব কোনো আইনগত সালিশী বা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা নেই- কাজেই অসংগঠিত কৃষককেই শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়।

উৎপাদক বিক্রেতা বাজার বিষয়ক তথ্যাদি কম জানে বিধায় দামের আগাম উত্থান-পতন সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না।

উৎপাদক বিক্রেতা পণ্যের বাজার, চাহিদা, যোগান, বিভিন্ন অঞ্চলে দাম, আমদানী-রপ্তানীর প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি বাজার বিষয়ক তথ্যাদি কম জানে বিধায় দামের আগাম উত্থান-পতন সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না কাজেই দর কষাকষির দিক থেকে বিক্রেতার অবস্থান থাকে দুর্বল।

গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য বাজারগুলো আকারে ছোট এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগ ও টেলিফোন যোগাযোগের অভাবে বাজারে বাজারে দরদামের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। ঘাটতি এলাকার দাম বৃদ্ধির খবর উদ্বৃত্ত এলাকার বাজারগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে না- যার জন্য এলাকাভিত্তিক দরদামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এতে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

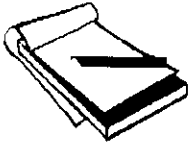
বিপণন সমস্যার প্রতিকারসমূহ

বাজারের মোট বিক্রেতা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদক বিক্রেতার অবস্থান অতি নগণ্য বিধায় এলাকা অনুসারে পণ্য ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা নিলে কৃষক বিক্রেতার দর কষাকষির সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমবায়ের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা হলে-- ফড়িয়া, ব্যাপারীরাও একত্রে অনেক পরিমাণ ক্রয়ের সুযোগ নিতে পারে। কৃষক-বিক্রেতা সংগঠিত থাকলে ওজনে হেরফের, অন্যায় চাঁদা ও অতিরিক্ত টোল প্রদান থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে বাজার থেকে বাজারে (গ্রাম্য বাজার থেকে গঞ্জের বাজার, মাধ্যমিক বাজার কিংবা নদীতীরে অবস্থিত ব্যবসাকেন্দ্র) সারা বছর চলাচল উপযোগী পাকা রাস্তা প্রতিষ্ঠা ও টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলে দ্রুত পণ্য পরিবহন ও দামের উঠানামা জানানো সম্ভব হবে। উদ্বৃত্ত এলাকা ও ঘাটতি এলাকায় সমতা আসবে এবং উৎপাদক কৃষক পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। অন্যদিকে ঘাটতি এলাকার ভোক্তাও তুলনামূলক কম দামে পণ্য ক্রয়ে সক্ষম হবে। পণ্যের স্থান উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে মোট চাহিদা বাড়বে।

পণ্য সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়নে গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে পণ্যাগার, গুদাম, হিমাগার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিখাতে সহজশর্তে বিশেষ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সারাদেশে পণ্য মৌজুত সুযোগ যত সৃষ্টি হবে ততই মৌসুম থেকে মৌসুমে দামের অতি উঠা-নামা বন্ধ হবে। সারাদেশে মৌজুত ব্যবস্থা ছড়িয়ে থাকবে বিধায় মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগও কম থাকবে। গুদাম, হিমাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পণ্যের সময় উপযোগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপান্তর উপযোগ বৃদ্ধি করবে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে (হিমাগার প্রতিষ্ঠা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে)। শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই একই ওজন পদ্ধতি (মেট্রিক ওজন পদ্ধতি) বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব। প্রত্যেকটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এ বিষয়ে তদারকী ব্যবস্থা চালু করা উচিত। ওজনে ঠকানো, দামে প্রবঞ্চনা, ক্রেতা-বিক্রেতার স্বীকৃত চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে বাজার কেন্দ্রিক জুরি কমিটি বা সালিশী ব্যবস্থা আইনগত কর্তৃত্বধীনে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। পণ্যের পর্যায়েতকরণ, প্রমিতকরণ (standardisation) ও ওজনের ভিত্তিতে বিক্রয়কে সর্ব পর্যায়ে উৎসাহিত করা আবশ্যিক। ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। বাজার সৃষ্টি ও গ্রাম্য বাজার সম্প্রসারণে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে।

শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই একই ওজন পদ্ধতি (মেট্রিক ওজন পদ্ধতি) বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব।



অনুশীলন (Activity) : বাংলাদেশে কৃষিজ দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

সারমর্ম : ভোক্তাদের পর্যায়ে খুচরা বিক্রয়ে পণ্যের যে দাম থাকে, কৃষকের খামারের দোরগোড়ায় সেই দামের কত অংশ পাবে তা মূলতঃ নির্ভর করে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে কতটি মধ্যসত্ত্বভোগী এবং দ্রব্যটি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় (যেমন- গম থেকে পাউরুটি) অন্যান্য উপকরণের সমাবেশ খরচ কতটুকু। স্থানগত উপযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে ক্ষুদ্রে ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, বেপারী, মহাজন বা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। বাজার ব্যবস্থায় এরা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যসত্ত্বভোগী বা বিপণন কারক। কৃষকগণ প্রতিটি মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। অঞ্চলে অঞ্চলে ওজন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। এই ওজনের হেরফেরেও উৎপাদক কৃষক পণ্য বিক্রয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য বাজারগুলো আকারে ছোট এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগ ও টেলিফোন যোগাযোগের অভাবে বাজারে বাজারে দরদামের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। পণ্য সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়নে গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করা উচিত। পণ্যের পর্যায়েতকরণ, প্রমিতকরণ (standardisation) ও ওজনের ভিত্তিতে বিক্রয়কে সর্ব পর্যায়ে উৎসাহিত করা আবশ্যিক।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. বাজারজাতকরণের সমুদয় খরচ হলো--
- উৎপাদন খরচ
 - বাজারজাত খরচ
 - বিপণন খরচ
 - শ্রমিকের খরচ
- খ. রূপান্তরিত পণ্যের উপযোগ--
- বৃদ্ধি পায়
 - কমে যায়
 - অপরিবর্তিত থাকে
 - মাসে মাসে কমে এবং মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পায়

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. দামের উঠানামা কমাতে হলে পণ্যের উপযোগ বৃদ্ধি করতে হয়।
- খ. পণ্য যেখানে উৎপাদিত হয় সেখানে চাহিদা নাও থাকতে পারে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. খামারের দোরগোড়া থেকে উৎপাদকের ঘরে পণ্য নিয়ে আসাটাই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া।
- খ. পণ্য বিক্রয়ে অধিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি হলে ভোক্তা সবচেয়ে কম দামে পণ্য ক্রয় করতে পারে।



পাঠ ৩.৪ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ী ঋণ ব্যবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- কৃষি খাতের ঋণ প্রবাহে কৃষি ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় ব্যবস্থায় ঋণ প্রবাহের ধরন বিবৃত করতে পারবেন।



বাংলাদেশের কৃষিতে অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তন খামার উৎপাদন কার্যক্রমে জড়িত। একই খামারে মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ঝড়, বন্যা, খরা, আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, পোকামাকড়ের উপদ্রবের মত অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃষক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলনের অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। অনেক কৃষকই উৎপন্ন ফসলে তার পারিবারিক ভোগের প্রয়োজন পুরোপুরি মিটাতে পারে না। ভালো আবহাওয়ায় থেকে অধিক উৎপাদন হলে পণ্য মূল্য পড়ে যায়, যার জন্য কৃষি আয় এই মূল্য ঝুঁকি জনিত কারণেও কম হতে পারে। ভোগে ঘাটতি, আয়ে ঘাটতি কিংবা উভয় কারণে কৃষি খাতে মূলধন গড়ে ওঠা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিংবা নগন্য মূলধনেই কৃষিকার্য পরিচালনা করতে হয়। যখন পরিবারের ভোগে ঘাটতি পড়ে, কিংবা মূলধন উপকরণের অভাব হয় (যেমন- বীজ, সার, গবাদিপশু, সেচের নলকূপ ইত্যাদি), পূর্বতন দায়দেনা শোধ করতে হয়, আকস্মিক কোনো বিপর্যয় ঘটে (যেমন- গবাদিপশুর মৃত্যু, বান-বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়া) অথবা বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আকস্মিক খরচ হয়, স্বল্পবিত্ত কৃষক পরিবার এসব অবস্থায় প্রায়শঃ ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়ে থাকে। কৃষিপণ্য ব্যবসায় যারা জড়িত, অধিক পণ্য ক্রয়, পরিবহন, সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণে পুঁজির দরকার হয়। নিজ জোত-জমা সংলগ্ন কিংবা সুবিধামত জমি ক্রয়ে কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা অনুভব করে।

কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা দু'টি উৎস থেকে মিটাতে চেষ্টা করে, যেমন- ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ধনী কৃষক, সুদখোর মহাজন, আত্মীয়-স্বজন। এদের থেকে জমি বন্ধক রেখেও ঋণ নেয়া হয়। এসব ঋণ বিনা সুদ থেকে উচ্চ হারের সুদে নিতে হয়। কৃষিখাতের মোট ঋণ প্রবাহের শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ বা দুই তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাসমূহ, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (যেমন ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি ইত্যাদি)।

কৃষি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষি ঋণ সরবরাহের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। পাকিস্তান আমল থেকেই কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনে মূলধনী উপকরণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণে চলতি মূলধন, কুটির শিল্প স্থাপন, পশুপালন ও মৎস্য চাষে স্বল্পমেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু ক্রয় ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী ঋণ এবং গুদাম নির্মাণ, ভূমি উন্নয়নে, রাবার চাষ, চা বাগান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেড় বছরের মধ্যে পরিশোধ সম্পন্ন করতে হয়। মধ্যমেয়াদী ঋণ পাঁচ বছরের মধ্যে এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাঁচ বছর থেকে বিশ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। কৃষিখাতে উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়ন খাতে গ্রামাঞ্চলে ঋণের সুবিধা প্রদান কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান প্রধানতম উদ্দেশ্য। ১৯৯৬ আর্থিক বছরে গ্রামীণ এলাকার সরকারী ব্যাংকিং খাতের মোট কৃষি ঋণ প্রবাহের শতকরা ৬৫ ভাগ সরবরাহ করেছে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। ঐ একই সনে বি.আর.ডি.বি (বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) সরবরাহ করেছে শতকরা ৬.১৪ ভাগ ঋণ (সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে)। ১৯৯৫-৯৬ সনে সারা বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের শাখা ছিল ৮৩৬ টি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রামীণ শাখার মাধ্যমে স্বাভাবিক কৃষি ঋণ ও সরকারের প্রবর্তিত বিশেষ ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রচলিত সমবায় পদ্ধতির আওতায় বাবাংলাদেশে সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গ্রামীণ এলাকায় সমবায় সমূহের সদস্যদের মাঝে ঋণ সরবরাহ করে থাকে (সামগ্রিক বিবেচনায় নগন্য)। নিম্নের সারণিতে কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সনের বিতরণকৃত মোট টাকার পরিমাণ দেখানো হলো।

কৃষিখাতে উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়ন খাতে গ্রামাঞ্চলে ঋণের সুবিধা প্রদান কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান প্রধানতম উদ্দেশ্য।

সারণি ৩.৪.১ ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৫৫-৯৬ সন পর্যন্ত কৃষিখাতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের
বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ

বছর	মোট বিতরণকৃত ঋণ কোটি টাকা	বৃদ্ধির বাৎসরিক শতকরা হার
১৯৯০-৯১	৩২৪.১৭	--
১৯৯১-৯২	৪৪১.৭৮	৩৬.২৮
১৯৯২-৯৩	৪৬৩.৪২	৫.০০
১৯৯৩-৯৪	৫৯৮.৫৬	২৯.০০
১৯৯৪-৯৫	৭৬৫.৬৩	২২.০০
১৯৯৫-৯৬	৭৭৮.৯১	১.৭১

কৃষিব্যাংক পরিক্রমা, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা নং ৩৯

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণের চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের জন্য কৃষি ব্যাংকের বার্ষিক সুদের হার শতকরা ১৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা।

সমবায়ী ঋণ ব্যবস্থা

দুই ধরনের সমবায় সমিতিগুলোর
মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় এখনো ঋণ
প্রবাহ চালু রয়েছে।

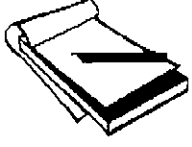
স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এদেশে দুই ধরনের সমবায় ব্যবস্থা হয়েছিল, যেমন প্রথাগত সমবায়
সমিতিসমূহ এবং কুমিল্লা পদ্ধতির দুই স্তর বিশিষ্ট সমবায় যেমন- (ক) গ্রামের প্রাথমিক সমবায় সমিতি
ও (খ) থানা পর্যায়ে এগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। এই দুই ধরনের সমবায় সমিতিগুলোর
মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় এখনো ঋণ প্রবাহ চালু রয়েছে। কুমিল্লা পদ্ধতির দুইস্তর বিশিষ্ট সমবায়গুলো
বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডের (বি.আর.ডি.বি) মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বি.আর.ডি.বি-র সমবায়
সমিতিগুলো সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষিখাতে ঋণ পেয়ে থাকে।
প্রচলিত পদ্ধতির বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দিয়ে থাকে ১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক
লিমিটেড ২) ৬২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং এদের সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৩) দেশের
১৬টি ভূমি বন্ধকী সমবায় ব্যাংক। ভূমি বন্ধক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ
ব্যাংক কর্তৃক যোগানকৃত কৃষি ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ এই সমস্ত সমবায় ব্যাংক ও সমিতি সমূহের
মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সন
পর্যন্ত বি, আর, ডি, বি ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের প্রবাহ দেখানো
হলো।

সারণি ৩.৪.২ ১৯৯১/৯২ সন থেকে ১৯৯৫/৯৬ সন পর্যন্ত সমবায়ী ব্যবস্থায় প্রদত্ত কৃষি ঋণের
প্রবাহ

বছর	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও সংস্থা (কোটি টাকা)	
	বি, আর, ডি, বি	সমবায় ব্যাংক লিঃ
১৯৯০-৯১	৪৯.৯	২.৩
১৯৯১-৯২	১৭.৪	৩.১
১৯৯২-৯৩	১১.৯	৩.৪
১৯৯৩-৯৪	১২.০	১.২
১৯৯৪-৯৫	৭৩.২	১.৯
১৯৯৫-৯৬	৯১.০	১.৮

উৎস : ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ, ১৯৯৭।

সমবায় ব্যাংক সমূহের ঋণ কার্যক্রমে, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে সুদের হার কম। তবে ঋণ
প্রদানযোগ্য তহবিলের অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে খুব কম সংখ্যক কৃষক এই উৎসের
সুবিধা পেয়ে থাকে।



অনুশীলন (Activity) : বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : ঝড়, বন্যা, খরা, আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, পোকামাকড়ের উপদ্রবের মত অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃষক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা দু'টি উৎস থেকে মিটাতে চেষ্টা করে, যেমন- ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ধনী কৃষক, সুদখোর মহাজন, আত্মীয়-স্বজন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাসমূহ, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। কৃষিপণ্য উৎপাদনে মূলধনী উপকরণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণে চলতি মূলধন, কুটির শিল্প স্থাপন, পশুপালন ও মৎস্য চাষে স্বল্পমেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু ক্রয় ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী ঋণ এবং গুদাম নির্মাণ, ভূমি উন্নয়নে, রাবার চাষ, চা বাগান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. বাংলাদেশের কৃষক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করেন--
- যথেষ্ট পুঁজি হাতে নিয়ে কেননা উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ
 - সমবায়ের মাধ্যমে সকলেই সংগঠিত হয়ে
 - যথেষ্ট অনিশ্চয়তার মাঝে এবং সাধারণভাবে পুঁজির স্বল্পতার মধ্যে
 - সামগ্রিক আধুনিক ব্যবস্থাপনায়
- খ. কৃষক পরিবার ঋণ বেশি নিয়ে থাকে--
- ব্যাংকিং খাত থেকে
 - অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে
 - সমবায় সমিতি থেকে
 - কৃষি ব্যাংক থেকে

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. কৃষি ব্যাংকের সর্বমোট শাখা টি।
- খ. সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সমবায়ী ব্যবস্থায় প্রদত্ত মোট ঋণের BRDB-এর অংশ।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
- খ. কৃষিক্ষেত্র পদ্ধতিতে তিন স্তর বিশিষ্ট সমবায় ঋণ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।



পাঠ ৩.৫ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার কার্যাবলী

এই পাঠ শেষে আপনি--

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পল্লীঋণ কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লীঋণ আদায়ের হার বিবৃত করতে পারবেন।
- সরকারী ব্যাংকিং খাতের ঋণ আদায়ের সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পূর্বের কার্যরত সকল ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়। এভাবে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। যেগুলো ছিল সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও উত্তরা ব্যাংক। পরবর্তী সময়ে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক দু'টিকে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া হয়। গোড়ার দিকে জাতীয়করণ করা ছয়টি ব্যাংকে কৃষিখাতে ঋণের প্রবাহ ছিল না। ১৯৭৩ সনের শেষ দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিখাতে ঋণ প্রবাহে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে কৃষিঋণ/পল্লীঋণ বিভাগ খোলার নির্দেশ দেয়। এরপর থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো শিল্পপুঁজি সরবরাহ ও ব্যবসা কার্যক্রমের সংগে কৃষিঋণ/পল্লীঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক পল্লী এলাকায় শাখা খুলতে শুরু করে। গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক বাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক সমূহে শাখা খোলার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে যখন ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার ১০০ কোটি টাকার বিশেষ কৃষি ঋণ প্রকল্প কার্যক্রম চালু করে।

চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পূবালী ও উত্তরা ব্যাংক ছাড়া) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক মিলিয়ে সরকারী খাতের ব্যাংক সমূহের মোট ৫,৭৬২ টি শাখার মধ্যে (১৯৯৪ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) দুই-তৃতীয়াংশ শাখাই পল্লী এলাকায় অবস্থিত। নিম্নের সারণিতে, ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত সরকারী খাতে সকল ব্যাংক সমূহের মোট প্রদত্ত ঋণ ও গ্রামীণ ঋণ প্রবাহের হার দেখানো হলো :

সারণি ৩.৫.১ সরকারী ব্যাংকিং খাত থেকে ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ঋণ ও পল্লী ঋণের পরিমাণ

বছর	মোট প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকা)	মোট প্রদত্ত পল্লী ঋণ (কোটি টাকা)	মোট ঋণে পল্লী ঋণের শতকরা হার
১৯৯১	২১,৩৮৭.১৯	৪,৬৮৬.৪০	২১.৯
১৯৯২	২৩,৫৬৯.৫৫	৪,৭০১.৬৪	১৯.৯
১৯৯৩	২৬,৮২৯.৩৭	৫,১০৪.৫১	১৯.০
১৯৯৪	২৮,৩২৭.২০	৫,৬২৫.৬০	১৯.৯
১৯৯৫	২৯,২০৭.১০	৫,৭৫৩.৮০	১৯.৭
১৯৯৬	৩৪,৭০৮.০০	৬,৮৩৭.৪৮	১৯.৭

উৎস : ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

সরকারী ব্যাংকিং খাত সাধারণ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ এলাকা থেকে সঞ্চয় ও সংগ্রহ করে থাকে। নিম্নের সারণিতে সরকারী খাতের সকল ব্যাংক সমূহের মোট সঞ্চয়, পল্লী এলাকা থেকে গৃহীত সঞ্চয় ও মোট সঞ্চয়ে গ্রামীণ এলাকার অংশগ্রহণের হার দেখানো হলো।

সারণি ৩.৫.২ সরকারী ব্যাংকিং খাতের সংগৃহীত মোট সঞ্চয়, গ্রামীণ সঞ্চয় ও মোট সঞ্চয়ে গ্রামীণ সঞ্চয়ের হার দেখানো হল, ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত

বছর	মোট প্রদত্ত সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মোট প্রদত্ত পল্লী সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মোট সঞ্চয়ে পল্লী সঞ্চয়ের শতকরা হার
১৯৯১	২২,৮১৮.০২	৪,৮৯৩.৫৭	২১.৪
১৯৯২	২৬,১৮১.৫৭	৫,৬৩৩.৮৬	২১.৫
১৯৯৩	২৯,৯৪৫.৩৫	৬,৫১৫.৯৫	২১.৮
১৯৯৪	৩৩,৯৪৮.৪০	৭,৫০৪.৮০	২২.১
১৯৯৫	৩৮,৯২৪.০০	৮,৫৬৩.২৮	২২.০
১৯৯৬	৪১,৯৪১.০০	৯,৫২০.৬১	২২.৭

উৎস : ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

পল্লী এলাকায় মোট ঋণের প্রবাহ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ দু'টিই বাড়ছে।

পল্লী এলাকায় মোট ঋণের প্রবাহ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ দু'টিই বাড়ছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে কেবল ১৯৯১ সন ছাড়া পরবর্তী বছরগুলোতে গ্রামীণ এলাকায় সঞ্চয়ের হারের চেয়ে পল্লী ঋণের হার ছিল কম। এর অর্থ এই যে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত তহবিলের চেয়ে ঋণ প্রদান হয়েছে কম। তবে সংগৃহীত তহবিলের জন্য সরকারী ব্যাংকিং খাত শতকরা একশত ভাগ দায়বদ্ধ থাকলেও ঋণের শতকরা একশত ভাগ ব্যাংকে পরিশোধিত নাও হতে পারে। ঋণের টাকা কিস্তি অনুযায়ী যথাসময়ে ফেরত না আসা বাংলাদেশে সরকারী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ কারণেই ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। নিম্নের সারণিতে ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সময়ে প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিশোধযোগ্য টাকা, আদায়ের পরিমাণ, আদায়ের হার ও বকেয়া টাকার পরিমাণ দেখানো হলো। এই সারণি থেকে দেখা যাবে আদায়কৃত ঋণের হার প্রদত্ত ঋণের গড়ে ২০ ভাগের বেশি নয়।

সারণি ৩.৫.৩ ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সন পর্যন্ত কৃষি ঋণের পরিশোধযোগ্য পরিমাণ, আদায়কৃত পরিমাণ, আদায়ের হার ও বকেয়ার পরিমাণ দেখানো হল।

বছর	আদায়যোগ্য (কোটি টাকা)	আদায়কৃত (কোটি টাকা)	আদায়ের শতকরা হার	বকেয়ার মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)
১৯৯০-৯১	৪৬৮৮.৬৯	৬৭৪.৭১	১৪.২৯	৪০৪৮.২৩
১৯৯১-৯২	৪৯৩৬.৭৮	১১৬০.৬০	২৩.৬৫	৩৭৪৭.৫০
১৯৯২-৯৩	৪৭১৯.৯৩	৮৬৯.২৩	১৮.৪২	৩৮৫৪.৩৬
১৯৯৩-৯৪	৫১৪১.৮৬	৯৭৯.১২	১৯.০৪	৪২০৩.৭২
১৯৯৪-৯৫	৫৬১৩.২৫	১১২৪.১১	২০.০৩	৪৪৯০.৫৩
১৯৯৫-৯৬	৬১৯৩.৫০	১২৭৩.০৮	২০.৫৬	৪৯২০.৪২

উৎস : ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

সরকারী ব্যাংকিং খাতে কৃষি ঋণ আদায়ের হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও গ্রামীণ ব্যাংকসহ এন.জি.ও গুলোর ঋণ আদায়ের পরিমাণ অবশ্য উৎসাহ ব্যঞ্জক। সরকারী ব্যাংকিং খাতের (বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংক সমেত) ঋণ আদায়ে হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতির অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ-

১. ঋণ প্রদানে তুলনামূলক আনুষ্ঠানিকতা বেশি (দরখাস্ত, ষ্ট্যাম্প ব্যবহার, বন্ধক কাগজপত্র তৈরি, অনেক পর্যায়ে অনুমোদন ইত্যাদি) বিধায় বিতরণে বিলম্ব ঘটে। এতে যে উদ্দেশ্যে ঋণ চাওয়া হয় তাতে ব্যয়িত না হলে পরিশোধ কষ্টকর হয়ে উঠে।

২. ব্যাংক কর্তৃক আবেদনকারীর যথার্থতা বা সঠিক প্রয়োজনীয়তা খুব সতর্কতার সংগে নিরূপনে ব্যর্থতা। কাজেই ঋণ যথাযথ ব্যবহার হয় না।
৩. ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ততার সম্পর্ক স্থাপিত হলে, যথাযথ ব্যক্তির কাছে ঋণ না যাওয়া।
৪. ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের ক্ষেত্রে নিবিড় তত্ত্বাবধায়নের অভাব।
৫. আয়ের সংগে কিস্তি পরিশোধের সমন্বয় না হওয়া। অর্থাৎ দুর্ভবতী গাভীর জন্য ঋণ দিলে দোহন আরম্ভের পর ত্রৈমাসিক কিস্তি ঋণ হলে তিনমাসের মধ্যে আয় অন্যত্র ব্যয় হয়ে যায়। সেটাকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে নেয়া।
৬. কৃষি কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন কিংবা দামের দিক থেকে উৎপাদন অলাভজনক হলে কৃষক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় যা যথাসময়ে পূর্ণ:তফসিলিকরণ করা হয় না- ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।
৭. কৃষি খাতে ঋণ কার্যক্রম বহুদিক থেকে ভিন্নধর্মী তাই নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মাঠে উপস্থিত না থাকলে সময়মত ঋণ পরিশোধ হয় না।
৮. ব্যাংক কর্মীদের পল্লীঋণ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট প্রশিক্ষণ থাকে না কিংবা গ্রামে কাজ করার মত মানসিক নৈকট্য অনুভব করে না। ফলে ঋণ প্রদানকারী ও গ্রহীতার দূরত্ব থেকে যায়। যার ফলে খাতক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে আগ্রহ অনুভব করে না।
৯. সর্বোপরি অনাদায়ের ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতার কারণে তুড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তুলনামূলক ধনী কৃষক ঋণ গ্রহীতা হলে এ সুযোগ নিয়ে থাকে।

অনুশীলন (Activity) : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীর অগ্রগতি বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : ঋণের টাকা কিস্তি অনুযায়ী যথাসময়ে ফেরত না আসা বাংলাদেশে সরকারী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ কারণেই ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কৃষি কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন কিংবা দামের দিক থেকে উৎপাদন অলাভজনক হলে কৃষক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় যা যথাসময়ে পূর্ণ:তফসিলিকরণ করা হয় না- ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।





পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. সরকারী খাতের ব্যাংক সমূহের মোট শাখা--

- i. প্রায় ১০.০০০ (দশ হাজার)
- ii. ৯.৫০০ (নয় হাজার পাঁচশত)
- iii. ৫.০০০ (পাঁচ হাজার)
- iv. ৫.৭৬২ (পাঁচ হাজার সাতশত বাষট্টি টি)

খ. সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী প্রদত্ত পল্লীঋণ, পল্লী থেকে গৃহীত মোট সঞ্চয়ের--

- i. প্রায় ৭২ শতাংশ (৭১.৮২)
- ii. প্রায় ৮০ শতাংশ
- iii. প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
- iv. প্রায় সমান সমান

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মোট ঋণপ্রবাহ পল্লী ঋণের সর্বশেষ হার প্রায়।

খ. ১৯৭৭ সালে কোটি টাকার বিশেষ কৃষিক্ষণ প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ঋণের টাকা যথাসময়ে ফেরত না দেয়ায় ব্যাংকের ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি বাহত হয়।

খ. সময়মত কৃষিক্ষণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মাঠে উপস্থিত থাকা।



পাঠ ৩.৬ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেসরকারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের কার্যক্রম বিবৃত করতে পারবেন।
- গ্রাম উন্নয়নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



পল্লীর ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত পুরুষ মহিলাদের দল গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামে দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৭৬ সনের দিকে শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ ইউনুস। জোবরা গ্রামের স্বল্প পরিসরে দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার ও ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের সফলতার অভিজ্ঞতায় নভেম্বর, ১৯৭৯ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা করা হয় চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায়। ১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর থেকে বিশেষ পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে সারা দেশব্যাপী এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক সহজশর্তে দলীয় ভিত্তিতে (ঋণের জন্য অনাস্থীয় পাঁচজন পুরুষ কিংবা পাঁচজন মহিলা প্রথমে একটি দল গঠন করবে) উৎপাদন বা ক্ষুদ্র ব্যবসা কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক দলে থাকবে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সচিব। এ ঋণ গ্রহণের জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয়না। দল ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দলের সবাই একসঙ্গে ঋণ পায় না। দল থেকে বাছাই করা প্রথম দু'জনকে ঋণ দেয়া হয়, তাদের ঋণ পরিশোধের শেষ পর্যায়ে অন্য সদস্যগণ ঋণ গ্রহণের আবেদন জানাতে পারে। প্রত্যেক সদস্য সর্বাধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। দলের কোনো সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোনো সদস্যই আর পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। সকল ভূমিহীন পুরুষ, মহিলা কিংবা যাদের চাষাধীন জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ অথবা এর নিচে তারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য। কৃষি কাজ ছাড়াও সকল প্রকার আয় সৃষ্টিকারী কাজ যেমন- রিস্তা, ভ্যানগাড়ী ক্রয়, ধানভানা, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ এবং শাকসবজি চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যায়। ঋণ গ্রহণের এক সপ্তাহ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হয় এবং তা সর্বোচ্চ ৫০ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হয়। কিস্তি আদায়ে ব্যাংককর্মী প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত দলীয় সভায় উপস্থিত থাকেন। ঋণ পরিশোধে কাউকে ব্যাংকে যেতে হয় না। প্রতি পুরুষ ব্যাংককর্মী ২৫০ জন ঋণ গ্রহীতা ও প্রতি মহিলা ব্যাংককর্মী ১৫০ জন গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যকে তত্ত্বাবধান করে। মোট ঋণের শতকরা দুই টাকা হারে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ নেয়ার সময় মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা পাঁচভাগ টাকা প্রত্যেক গ্রহীতাকে দলীয় তহবিলে জমা রাখতে হয়। এছাড়াও দলীয় তহবিলে প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সপ্তাহে এক টাকা করে জমা রাখতে হয়। কোনো সদস্য উৎপাদন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সকলের অনুমতি নিয়ে এই তহবিল থেকে আপদকালীন ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক শতকরা ৯৮ ভাগ সফল হয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফলতা ও গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিবিড় তদারকী ব্যবস্থা। মার্চ, ১৯৯২ সন পর্যন্ত মোট ঋণ গ্রহীতা সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,৪৯,৩৪৫। এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ১০,৬৭,৩৫২ জন অর্থাৎ মোট ঋণ গ্রহীতার প্রায় ৯৩ শতাংশ। ঐ একই সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক ব্র্যাকের সংখ্যা ছিল ৯৪৮ টি। নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে ঋণদান খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি। দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গরীবদের জন্য ঋণ প্রদান ও তা পরিশোধে ব্যাপক সফলতার কারণে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক দেশে বিদেশে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে।

ঋণ নেয়ার সময় মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা পাঁচভাগ টাকা প্রত্যেক গ্রহীতাকে দলীয় তহবিলে জমা রাখতে হয়।

ব্র্যাক : বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (Bangladesh Rural Advancement Committee) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (NGO)। স্বাধীনতার পর (১৯৭২ সনে) যুদ্ধের কারণে দুঃস্থ ও বিধ্বস্ত পরিবার সমূহের পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে এই সংস্থার জন্মলাভ। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ। বিদেশী সাহায্য সহযোগিতাকে কাজে

চাষযোগ্য এক একর পর্যন্ত যাদের জমি রয়েছে সে সমস্ত কৃষক ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমের অওতা আসতে পারে।

লংগনের মধ্যদিয়ে ব্র্যাক সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলে। মূলতঃ স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পূর্ণবাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এন.জি.ও কার্যক্রমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। এখনো সংস্থাটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী দান-অনুদানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। ব্র্যাকের রয়েছে গ্রাম উন্নয়নমুখি বহু কার্যক্রম। এটি মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে। চাষযোগ্য এক একর পর্যন্ত যাদের জমি রয়েছে সে সমস্ত কৃষক ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারে। ফসল উৎপাদন ও ছোট ব্যবসায় দেয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। মৎস্য চাষ ও পোল্ট্রি ফার্ম প্রতিষ্ঠায় বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়। প্রতি তিনমাসে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং কুটির শিল্প সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ব্র্যাক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশী এন.জি.ও হিসেবে প্রশিকা ১৯৭৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি এ সবই বেসরকারী দেশীয় এন.জি.ও। সবক'টি বিদেশী সাহায্য সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামে গরীবদের জন্য ঋণদান কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাধান্য দিয়ে বেশ কিছু বিদেশী সাহায্য সংস্থাও আমাদের দেশে কাজ করে যাচ্ছে যেমন- কেয়ার (Cooperation of American Relief Everywhere), সিডা (Swedish International Development Agency) ক্যারিটাস (CARITAS), উসেপ (UCEP)। এ সব গুলোই বিদেশী সাহায্য ও অনুদানে পরিচালিত। দেশী-বিদেশী এন.জি.ও গুলোর জন্য হতাশা ব্যাঞ্জক দিক হলো, কোনো কারণে বিদেশী আর্থিক সহায়তা বন্ধ হলে বা খুব কমে গেলে, এসব বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম ও ঋণ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা এমন সংকোচিত হবে যে এগুলোর ভূমিকা হয়ে পড়বে অনুল্লেখ্য।

অনুশীলন (Activity) : কীভাবে বেসরকারী সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করেছে তার বর্ণনা দিন।

সারমর্ম : পল্লীর ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত পুরুষ মহিলাদের দল গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান। জোবরা গ্রামের স্বল্প পরিসরে দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার ও ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের সফলতার অভিজ্ঞতায় নভেম্বর, ১৯৭৯ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা করা হয় চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায়। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক শতকরা ৯৮ ভাগ সফল হয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফলতা ও গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিবিড় তদারকী ব্যবস্থা। মূলতঃ স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পূর্ণবাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এন.জি.ও কার্যক্রমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্র্যাকের রয়েছে গ্রাম উন্নয়নমুখি বহু কার্যক্রম। এটি মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে।



পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে--

- বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক
- বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রকল্প
- একটি সরকারী উন্নয়ন ব্যাংক
- একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এন.জি.ও)

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ আদায় সাফল্যের মূল কারণ--

- ডঃ মুহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্ব
- ব্যাংক শাখাগুলো গ্রাম এলাকায় প্রতিষ্ঠিত
- শুধু গরীবরা ঋণ নেয় বলে
- দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

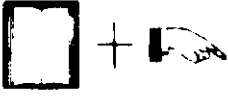
ক. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভব থেকে।

খ. ব্র্যাক একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ব্র্যাক সংস্থাটি সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে চলে।

খ. গ্রামীণ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের এক সপ্তাহ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হয়।



পাঠ ৩.৭ কৃষি ঋণের বিতরণ সমস্যা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- কৃষি ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা বিবৃত করতে পারবেন।
- কৃষি ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণে কার্যকরী পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



পূর্বের কয়েকটি পাঠ অনুশীলনের পর কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস সম্পর্কে সরকারী ব্যাংকিং সেক্টর ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের ঋণ প্রদান পদ্ধতি, ব্যবহার-কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। সকল উৎস মিলিয়েই প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ প্রবাহ এখনো অপ্রতুল এবং দেশের বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বাইরে। পারিবারিক ভোগ চাহিদার বাইরে, বাজারের জন্য উদ্ভূত সৃষ্টিতে কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়াসী হলে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত বীজ, সেচ সুবিধা, সার প্রয়োগ, পোকা-মাকড় দমন এমনকি যান্ত্রিক চাষাবাদ, মাদুই ইত্যাদি। এসবের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট নগদ অর্থের যার জন্য কৃষক-উৎপাদকের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার ঋণ সুবিধা প্রসারিত হতে পারে যদি বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে ফেরত আসে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে দু'টি ধারা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সরকারী ব্যাংকিং খাত থেকে যে ঋণ আসে সে ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ খুবই বেশি। ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্কীর্ণ টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে সরবরাহ করে। তা ফেরত না এলে ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পরতে পারে। দ্বিতীয় ধারাটি হলো গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকার মত বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রদত্ত ঋণ ৯৫-৯৯ শতাংশ যথাসময়ে পরিশোধিত হওয়া বা ফিরে আসা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বেসরকারী সংস্থাগুলোর সুদের হার কার্যতঃ ২০ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের মধ্যে যা সরকারী ব্যাংকিং খাতের তুলনায় উচ্চ সুদ বিবেচিত হতে পারে (১৪-১৬ শতাংশ)। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্ট বিতরণ ও যথাযথ তদারকি থাকলে গরীবদের কৃষি বা ব্যবসা খাতে দেয়া ঋণও যথাসময়ে পরিশোধিত হয়।

এখানে সরকারী ব্যাংকিং খাতের পল্লী ঋণ প্রবাহে প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হল--

উৎপাদন কার্যক্রমে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা, সময়মত ঋণ কিস্তি উঠিয়ে নেয়া, এসবের জন্য কৃষকের দোরগোড়ায় উপস্থিত থাকা অত্যাাবশ্যক।

১. বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের মূল কার্যএলাকা হলো গ্রাম। অথচ অনেক কর্মকর্তা গ্রামে বসবাসে অনীহা প্রকাশ করে। গ্রামীণ এলাকায় দীর্ঘকালীন অবস্থানে অনগ্রহ প্রায় সকলের। অথচ উৎপাদন কার্যক্রমে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা, সময়মত ঋণ কিস্তি উঠিয়ে নেয়া, এসবের জন্য কৃষকের দোরগোড়ায় উপস্থিত থাকা অত্যাাবশ্যক। সরকারী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে আসতে হয় ব্যাংকে (বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টো। বেসরকারী সংস্থার কর্মীরা তাদের কর্মসময়টা প্রায় পুরোটাই কাটান গ্রামে)।
২. কর্মকর্তাদের ব্যাংকের বাণিজ্যিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং পদ্ধতিগত বিভিন্ন নিয়মকানুনের ফলে, কৃষিঋণের জন্য জামানতের কাগজপত্র তৈরিসহ সময়মত ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এর ফলে প্রাপ্ত ঋণ কৃষকগণ সঠিক সময়ে সঠিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।
৩. কৃষি খাতের উৎপাদন কার্যক্রম যেমনি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তেমনি আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে বিরাজমান অবস্থার উপর নির্ভরশীলতার কারণে, শিল্প উৎপাদন কার্যক্রম থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। কৃষি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষ কারিগরী জনশক্তির অভাব কৃষি ব্যাংক সহ সরকারী ব্যাংকিং খাতে প্রকট। একারণে কৃষি প্রকল্প প্রণয়নে কৌশলগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুধাবন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। যে কারণে প্রদত্ত ঋণ উঠে আসে না।
৪. ঋণ গ্রহীতা বাছাই, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ, ফর্ম পূরণসহ নানা আনুষ্ঠানিকতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব কারণে ঋণ গ্রহীতা ও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আস্থার পরিবেশ নষ্ট হয়, যে কারণে ঋণ গ্রহীতা কৃষক যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কৃষি ঋণ ব্যবহারে সাফল্য ও অনাদায় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রামে কাজ করার জন্য বিশেষ উৎসাহ হিসেবে বোনাস, পদোন্নতিতে প্রাধান্য দেয়ার ব্যবস্থা থাকা কাজে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন।

১. কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। একারণে গ্রাম এলাকায় আরো অধিকসংখ্যক শাখা খোলা আবশ্যিক। গ্রামে যাতে কর্মকর্তাগণ অবস্থান করেন সেজন্য কঠোর নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২. কৃষি প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট অধিক হারে জনবল নিয়োগ, ঋণ তত্ত্বাবধানে ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। গ্রামে কাজ করার জন্য বিশেষ উৎসাহ হিসেবে বোনাস, পদোন্নতিতে প্রাধান্য দেয়ার ব্যবস্থা থাকা কাজে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। শুধু ঋণ প্রদান নয়, গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষকদের সঞ্চয়েও আগ্রহী করে তুলতে হবে যাতে ব্যাংকে তহবিল সংকটের সৃষ্টি না হয়।
৩. নিয়মকানুন যতটা সম্ভব সহজ করা আবশ্যিক যাতে ঋণ পেতে অধিক সময় নষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলোর ঋণ দল গঠনের উদাহরণ অনুসরণ করা যেতে পারে। ঋণের জামানত জমির পরিবর্তে দলকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
৪. ব্যাংকের সার্ভিস গ্রামে নিয়ে যেতে হবে যেন ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে না আসতে হয়। এতে ঋণ তদারকির ব্যবস্থাও নিবিড় হবে।
৫. প্রদত্ত ঋণের সুদের হার গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়- যাতে গ্রামের ঋণদান ব্যবস্থা লোকসানী ব্যবস্থায় পরিণত না হয়। দীর্ঘকালীন লোকসান বহন করা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব নয়।
৬. সরকারী ব্যাংকিং খাতের ঋণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ প্রদান এবং রাজনৈতিক কারণে ঋণের সুদ আসলসহ মওকুফ ঘোষণা করা হলে, নিয়মিত পরিশোধকারীরা হতাশাগ্রস্ত হতে পারে কিংবা ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ না করে ভবিষ্যতে এমন ঘোষণার প্রত্যাশা করতে পারে, যা ব্যাংকিং শৃঙ্খলাকে প্রবলভাবে বিনষ্ট করে। এ কারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবে বিতরণকৃত ঋণ সাধারণত পরিশোধিত হয় না।
৭. ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনে সুষ্ঠু হিসাব নিকাশ, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া ও প্রয়োজনে তৃপ্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সংগে ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাও জোরদার করা আবশ্যিক।

ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনে সুষ্ঠু হিসাব নিকাশ, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া ও প্রয়োজনে তৃপ্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে আরো গতিশীলতা আনয়নের প্রয়োজনে ঋণের প্রবাহ সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়েই বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলন (Activity) : কৃষি ঋণ বিতরণে কী সমস্যা হয়? কীভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় তার ধারণা দিন।



সারমর্ম : সকল উৎস মিলিয়েই প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ প্রবাহ এখনো অপ্রতুল এবং দেশের বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বাইরে। কর্মকর্তাদের ব্যাংকের বাণিজ্যিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং পদ্ধতিগত বিভিন্ন নিয়মকানুনের ফলে, কৃষি ঋণের জন্য জামানতের কাগজপত্র তৈরিসহ সময়মত ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এর ফলে প্রাপ্ত ঋণ কৃষকগণ সঠিক সময়ে সঠিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকের সার্ভিস গ্রামে নিয়ে যেতে হবে যেন ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে না আসতে হয়। এতে ঋণ তদারকির ব্যবস্থাও নিবিড় হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. কৃষি ঋণ কার্যক্রম সফল হতে পারে যদি
- অধিক পরিমাণে ঋণ দেয়া যায়
 - কৃষি কার্যক্রম লাভজনক হয়
 - সময়মত ঋণের কিস্তি পরিশোধ হয়
 - সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হয়
- খ. বেসরকারী সংস্থাগুলোর ঋণ কার্যক্রম সফলতার মূল কারণ
- সরকারী নিয়ন্ত্রণ
 - দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান ও নিবিড় তত্ত্বাবধান
 - বিদেশী উৎসের টাকা
 - জামানত দিতে হয় না বলে

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ঋণ পরিশোধের হার..... শতাংশ।
- খ. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে নিবিড় ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. সরকারী ব্যাংক হতে ঋণ ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রামে গিয়ে কৃষককে পৌছে দেন।
- খ. ব্যাংক ঋণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কখনই কাম্য নয়।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাজার কী? বাজারের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
- ২। অর্থনীতিতে অদৃশ্য প্রেরণা কী? বিবৃত করুন।
- ৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।
- ৪। একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারের পার্থক্য কীভাবে করবেন বর্ণনা করুন।
- ৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
- ৬। প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় দামের পার্থক্য কেন হতে পারে ব্যাখ্যা করুন।
- ৭। একচেটিয়া কারবারী বাজার কেন সৃষ্টি হয় বিবৃত করুন।
- ৮। মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কেন বেশি বর্ণনা করুন।
- ৯। বাজারজাতকরণ বলতে কী বুঝায় বিবৃত করুন।
- ১০। বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের কী কী উপযোগ সৃষ্টি করে থাকে উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন।
- ১১। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন।
- ১২। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা হলে ক্রেতা-বিক্রেতার কী লাভ-ক্ষতি বিবৃত করুন।
- ১৩। কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা কীভাবে কাটিয়ে উঠা যায় লিখুন।
- ১৪। কৃষিক্ষণের প্রয়োজন কেন হয় বিবৃত করুন।
- ১৫। ঋণের উৎস সমূহ কী কী? কৃষি ব্যাংক কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো, ব্যাখ্যা করুন।
- ১৬। সমবায়ী কৃষকদের ঋণের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।
- ১৭। কেন কৃষিক্ষণের প্রয়োজন হয় বিবৃত করুন।
- ১৮। কৃষিক্ষণ প্রবাহে কৃষি ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
- ১৯। পল্লী এলাকা থেকে সংগৃহীত সঞ্চয় ও পল্লী এলাকায় প্রদত্ত ঋণ প্রবাহের তুলনামূলক আলোচনা করুন।
- ২০। কৃষিক্ষণ অনাদায় পরিস্থিতির বর্ণনা দিন ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
- ২১। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভব কীভাবে হলো বর্ণনা করুন।
- ২২। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিবৃত করুন।
- ২৩। ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
- ২৪। কিছু বিদেশী এন.জি.ও'র নাম উল্লেখ করুন।
- ২৫। এন.জি.ও গুলোর সাফল্য বিবৃত করুন।
- ২৬। সরকারী ব্যাংকিংখাত ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সফলতা বর্ণনা করুন।
- ২৭। সরকারী ব্যাংকিংখাতে কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের সমস্যাগুলো বিবৃত করুন।
- ২৮। কৃষিক্ষণ কার্যক্রমে সরকারী ব্যাংকিংখাতের সমস্যাগুলো কীভাবে কাটিয়ে উঠা যায় ব্যাখ্যা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ-৩.১

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| ১। ক. i | ১। খ. iv |
| ২। ক. বিনিময়ে | ২। খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |

পাঠ-৩.২

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. iv |
| ২। ক. সমজাতীয় | ২। খ. বিক্রেতাই |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |

পাঠ-৩.৩

- | | |
|--------------|-------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. i |
| ২। ক. সময়গত | ২। খ. পূর্ণ |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |

পাঠ-৩.৪

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii |
| ২। ক. আটশত ছত্রিশ | ২। খ. একানব্বই শতাংশ |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |

পাঠ-৩.৫

- | | |
|-------------------|-----------|
| ১। ক. iv | ১। খ. i |
| ২। ক. এক পঞ্চমাংশ | ২। খ. ১০০ |
| ৩। ক. স | ৩। খ. স |

পাঠ-৩.৬

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iv |
| ২। ক. জোবরা গ্রাম | ২। খ. স্বতন্ত্র |
| ৩। ক. স | ৩। খ. স |

পাঠ-৩.৭

- | | |
|-------------|---------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii |
| ২। ক. ৯৫-৯৯ | ২। খ. তদারকির |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |

ইউনিট ৪

খামার ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা

ইউনিট ৪ খামার ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা

খামার ব্যবস্থাপনা বলতে দুটো বিষয়কে বোঝায়- খামার ও ব্যবস্থাপনা। খামার হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের একেকটি মূল ইউনিট। আক্ষরিক অর্থে খামার বলতে বোঝায় সাধারণত এক বা একাধিক জমি যেখানে ফসল, ফলমূল, গবাদিপশু ইত্যাদি জন্মানো হয়। খামার বলতে পুকুর বা জলাভূমিকেও বোঝায়, যেখানে মাৎস্যচাষ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় ধারাবাহিকভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে খামারের উৎপাদন কর্মকান্ড সংগঠন ও পরিচালনা করা। এ ইউনিটের পাঠে বিভিন্ন খামার ব্যবস্থাপনার ধারণা ও নীতিমালা, খামারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, খামারের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



পাঠ ৪.১ খামার ব্যবস্থাপনার ধারণা, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- খামার ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- খামার ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- খামার কত প্রকার ও কী কী সে সম্পর্কেও ধারণা পাবেন।



খামার ব্যবস্থাপনার ধারণা ও সংজ্ঞা

খামার ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে খামারকে একটি ব্যবসা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই, খামার ব্যবসার লাভ লোকসানের সাথে জড়িত সিদ্ধান্তগুলোই খামার ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যেমন- একটি খামার, জমি, শ্রম, মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। খামারের জমি হতে পারে নিজস্ব মালিকানাধীন বা বর্ণা বা বন্ধকী অথবা কিছুটা নিজস্ব, কিছুটা বর্ণা বা বন্ধকী। খামারের জমি হতে পারে এক জায়গায় পাশাপাশি অথবা বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো খণ্ডে বিখণ্ডিত। তেমনিভাবে, খামারে ব্যবহৃত শ্রমিক হতে পারে পারিবারিক শ্রমিক বা কেনা শ্রমিক। খামারের মূলধন আসতে পারে পারিবারিক উৎস থেকে অথবা ব্যাংক বা অন্য কোনো উৎস থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ হিসাবে।

খামার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খামারের বিভিন্ন ফসল বা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

এ্যান্ড্রু বসের সংজ্ঞানুসারে, খামার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে খামারের উৎপাদন সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট পরিচালন কাজে ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক নীতিমালার প্রয়োগ। জি. এফ. ওয়ারেন এর মতে খামার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খামারের বিভিন্ন ফসল বা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

খামার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

খামার ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের সাহায্যে সীমিত উপকরণসমূহ যেমন- জমি, শ্রম, পুঁজি ও যন্ত্রপাতি এসবের যথাযথ ব্যবহার করে খামারের মোট উৎপাদন বা মুনাফা বৃদ্ধি করা যায়। একজন কৃষকের একাধিক লক্ষ্যও হতে পারে যেমন-

- কম খরচে বেশি উৎপাদন করা,
- খরচ যাই হোক মুনাফা সর্বাধিক করা,
- উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক রেখে খরচ কমিয়ে আনা বা
- আয় ব্যয় যা হোক, নেহায়েত পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্য কোনো বিশেষ ফসল বা পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করা।

খামার ব্যবসার উপাদানসমূহ

খামার ব্যবসার মূল উপাদানগুলোর মধ্যে পড়ে-

- ক. ভূমির উন্নয়ন : খামার বাড়ীঘর, গোয়াল ঘর, জমির চারপাশে বেড়া, সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদি।
- খ. শ্রম : পারিবারিক বা কেনা মানব শ্রম বা পশু শ্রম।
- গ. মূলধন : চাষাবাদের যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, জোয়াল, মই, নিড়ানী ইত্যাদি), পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, সেচযন্ত্র, নিড়ানী যন্ত্র, স্প্রেয়ার মেশিন, বীজ, সার, পশু খাদ্য, মেশিনের জন্য জ্বালানী তৈল ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে খামার পরিচালনার জন্য নিজের বা ধার করা নগদ টাকা।
- ঘ. ব্যবস্থাপনা : খামারের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধন - এসবের দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদনুযায়ী খামার পরিচালন।

খামার ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তসমূহ ও নীতিমালা

প্রত্যেকটি কৃষকই হচ্ছে একেকজন ব্যবসায়ী বা ব্যবস্থাপক, কারণ তাকে খামার পরিচালনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঝুঁকি বহন করতে হয়। কৃষকদেরকে প্রধানত: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে হয় :

- ক. কী উৎপাদন করা হবে?
- খ. কতটুকু উৎপাদন করা হবে?
- গ. কীভাবে উৎপাদন করা হবে?

ক. কী উৎপাদন করা হবে?

দু'টো প্রতিযোগী ফসলের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাবের মাধ্যমে কৃষক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কোন্ ফসলটি করা বেশি লাভজনক হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য খামারের আন্ত-উৎপাদ বিষয়ে জানতে হবে। অর্থাৎ, একটি খামারে বিভিন্ন ধরনের ফসল, যেমন, ধান, পাট, গম, ইক্ষু, তামাক, ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। ধানের মধ্যে বৃষ্টি-নির্ভর দেশী ধান বা সেচ নির্ভর উচ্চ ফলনশীল ধান (উফশী) বা দুটোই উৎপাদন করা যেতে পারে। আবার, একই মৌসুমে কোনো জমিতে একটি ফসল করলে অন্য ফসল করা যায় না। যেমন, আউশ মৌসুমে কোনো জমিতে ধান করলে ঐ জমিতে আর পাট করা যায় না। এ ক্ষেত্রে আউশ ধান ও পাটকে দুটো প্রতিযোগী ফসল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কৃষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ ফসলটি কতটুকু করবে, পুরোটা পাট নাকি পুরোটা আউশ ধান, নাকি কিছু অংশে পাট ও কিছু অংশে আউশ ধান করবে। এ দু'টো প্রতিযোগী ফসলের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাবের মাধ্যমে কৃষক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কোন্ ফসলটি করা বেশি লাভজনক হবে। এমন কি, তুলনামূলক আয়-ব্যয় হিসাব করলে এমনও হতে পারে যে, কোনো ফসল উৎপাদন না করে বরং ঐ জমিতে পুকুর কেটে মাছ চাষ করলে আরও বেশি লাভ করা যাবে।

খ. কতটুকু উৎপাদন করতে হবে?

যে ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে আয় বেশি হবে, কৃষক সেই ফসল বেশি পরিমাণে করতে চাইবে।

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য উপাদান-উৎপাদ সম্পর্ক বিষয়ে জানা দরকার। অর্থাৎ, বিভিন্ন ফসলের কতটুকু উৎপাদন করা সব চেয়ে লাভজনক হবে তা নির্ভর করে কোনো ফসলের উৎপাদন খরচ কত, ফলন কী পরিমাণ, প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধন আছে কিনা, কৃষকের পারিবারিক চাহিদা কতটুকু, কোন্ ফসলের বাজার দাম কত, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। যে ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে আয় বেশি হবে, কৃষক সেই ফসল বেশি পরিমাণে করতে চাইবে।

গ. কীভাবে উৎপাদন করা হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য খামারে ব্যবহার্য আন্ত-উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। যেমন-কোনো ফসল উৎপাদন করতে কৃষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন্ উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহার করলে লাভ বেশি হবে বা খরচ কম হবে। যেমন, ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাশ এ তিন ধরনের সারের

কার্যকারিতা ও দাম ভিন্ন ভিন্ন। কৃষককে হিসাব করে দেখতে হবে যে ইউরিয়া সারের যে দাম তার সাথে ধানের দাম তুলনা করলে একরপ্তি কতটুকু ইউরিয়া ব্যবহার করলে ধান উৎপাদন করা লাভজনক হবে। ঠিক তেমনিভাবে, কৃষক হিসাব করে দেখবে যে সব খরচ ধরলে নিজের শ্যালো মেশিন দিয়ে সেচ দেয়া বেশি লাভজনক, নাকি নিজে শ্যালো মেশিন কেনা বা চালনা বাবদ বিরাট মূলধন ব্যয় না করে অন্যের মেশিন থেকে পানি কিনে সেচ দেয়াই বেশি লাভজনক হবে।

এ ছাড়াও, কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়-

ঘ. কোন্ পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে?

বাস্তব মৌসুমে কৃষক কোন্ পদ্ধতিতে ইরি ধান লাগাবে তা নির্ভর করে ঐ কৃষকের নিজের পারিবারিক শ্রম কী পরিমাণ আছে, আর কী পরিমাণ কিনতে পারবে তার ওপর।

একই ফসল বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যায়। যেমন- ইরি ধান লাইন করে লাগানো যায়, বা লাইন ছাড়াও অনিয়মিতভাবে লাগানো যায়। লাইনে লাগালে ফলন বেশি হয়, কিন্তু চারা লাগাতে বেশি শ্রম ও সময় লাগে। কাজেই বাস্তব মৌসুমে কৃষক কোন্ পদ্ধতিতে ইরি ধান লাগাবে তা নির্ভর করে ঐ কৃষকের নিজের পারিবারিক শ্রম কী পরিমাণ আছে, আর কী পরিমাণ কিনতে পারবে তার ওপর। তা ছাড়া কৃষক এও দেখবে যে লাইনে লাগালে ধানের ফলন যে পরিমাণ বাড়বে তা লাইনে লাগানোর বাড়তি খরচের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কিনা।

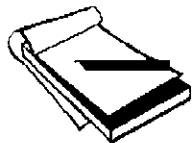
ঙ. কোথায় উৎপাদিত ফসল বিক্রি করা হবে?

আমাদের কৃষকরা বেশির ভাগ ফসলই উৎপাদন করে প্রধানত: পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। তবুও নগদ টাকার প্রয়োজনে উৎপাদিত ফসল ও পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে হয়। তাই কখন কোন্ বাজারে বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কৃষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে, কৃষককে পণ্যের পরিবহন খরচ ও তার যাতায়াতের জন্য যে সময় ব্যয় হবে তাও হিসাবে ধরতে হবে।

খামারের প্রকার ভেদ

খামার ব্যবসায় আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে কী ধরনের খামার স্থাপন করা হবে। খামার হতে পারে চিরাচরিত ফসলের খামার, যেখানে কেবল বিভিন্ন প্রকারের মাঠ ফসল উৎপন্ন করা হয়। তবে সেই সঙ্গে কিছু গবাদিপশু, গাভী, হাঁসমুরগী, ছাগল, ইত্যাদিও রাখা হয়। এসব খামার সাধারণত খোরপোশী ধরনের। অর্থাৎ, খামারে উৎপাদিত ফসল ও পণ্যদ্রব্য প্রধানত: পরিবারের ভোগ ও ভরণপোষণের জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে। ইদানিং অবশ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসমুরগির খামার, দুগ্ধ খামার, মাৎস্য খামারসহ বিভিন্ন প্রকারের খামারও অধিক সংখ্যায় গড়ে উঠছে। বাণিজ্যিক খামার বলতে এসব খামারকে বোঝায় যেখানে উৎপাদিত ফসল ও পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই বিক্রি করা হয় এবং উপকরণগুলোর প্রায় সবটায় কেনা হয়ে থাকে। তবে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মিশ্র খামারের সংখ্যাই বেশি। এ ধরনের খামার বহুমুখী, যাতে একই ব্যবস্থাপনার আওতায় জমিতে ফসলের চাষ, গৃহাঙ্গনে হাঁসমুরগী পালন ও শাকসব্জি চাষ, বাগানে ফলমূলের চাষ এবং বাড়ীর আশে পাশে বনায়ন করা হয়।

বাণিজ্যিক খামার বলতে এসব খামারকে বোঝায় যেখানে উৎপাদিত ফসল ও পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই বিক্রি করা হয় এবং উপকরণগুলোর প্রায় সবটায় কেনা হয়ে থাকে।



অনুশীলন (Activity) : আপনার এলাকায় একটি কৃষি খামার স্থাপনের লক্ষ্যে কী কী বিষয় বিবেচনা করবেন তা আলোচনা করুন।

সারমর্ম : খামার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যার সাহায্যে খামারের সীমিত উপকরণ সমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করে খামারের মোট উৎপাদন বা মুনাফা সর্বাধিক করা যায় বা অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনকে নিশ্চিত করা যায়। খামার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খামারের বিভিন্ন ফসল বা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সাংগঠনিক ও পরিচালনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। খামার ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে, কী উৎপাদন করা হবে, কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এসব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. খামার ব্যবস্থাপনায় একজন কৃষকের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে-
- নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করা
 - ফসলের সাথে হাসমুরগী, মাছ ও শাকসব্জি চাষ করা
 - নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা
 - খামারের মুনাফা সর্বাধিক করা।
- খ. কোনো জমিতে আউশ ধান না পাট উৎপাদন করা হবে তা নির্ভর করে-
- আউশ ধান ও পাটের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাবের ওপর
 - আউশ ধানের স্বাদ ও খাদ্যমানের ওপর
 - পাটের বাজার দামের ওঠানামার ওপর
 - পাট চাষে ব্যবহৃত শ্রমিকের মজুরির ওপর।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. খামার হচ্ছে একটি কৃষকের।
- খ. প্রতিটি কৃষকই হচ্ছে একেকজন বা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. খামার ব্যবসার মূল উপাদানের মধ্যে পরিবহন অন্যতম
- খ. খামার ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কম খরচে বেশি উৎপাদন করা

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

- ক. আউশ ধান ও পাট এ দু'টি কোন্ ধরনের ফসল?
- খ. বাণিজ্যিক খামারের ধরন কীরূপ?



পাঠ ৪.২ খামার পরিকল্পনা ও বাজেটিং

এই পাঠ শেষে আপনি--

- খামার পরিকল্পনার ধারণা ও ধাপগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজেটিং ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

খামার পরিকল্পনার ধারণা



খামার পরিকল্পনা হচ্ছে একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খামারের পরস্পর প্রতিযোগী এবং বিকল্প ফসলগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌গুলো উৎপাদন করা লাভজনক হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা হয়। খামার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক যাতে তার সীমিত ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলোর মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারে যে তার মুনাফা সবচেয়ে বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কৃষক তার জমিটি ব্যবহার করতে পারে ফসল উৎপাদনের জন্য অথবা হাঁস মুরগীর খামার করার জন্য অথবা পুকুর কেটে মাছ চাষের জন্য। ফসল করতে চাইলে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) নাকি দেশী জাতের ফসল করবে তাও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে উফশী ফসল করলে সেচ, সার ও কীটনাশক দেশী জাতের ফসলের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহার করতে হবে এবং সে কারণে কৃষককে বেশি বেশি পুঁজির সংস্থান করতে হবে। কাজেই খামার পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে কৃষকের সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে লাভজনক ফসল, পণ্য, প্রযুক্তি বা উপকরণগুলোকে বেছে নেয়া ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা।

খামার পরিকল্পনার ধাপসমূহ

খামার পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়। যেমন-

- প্রথম ধাপ : খামারের একটি সহজ পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতে কেবল প্রধান প্রধান ফসল ও কৃষি পণ্য উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহের ওপর জোর দেয়া হয়।
- দ্বিতীয় ধাপ : এ পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল ফসল ও কৃষি পণ্য উৎপাদনের সকল উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।
- তৃতীয় ধাপ : এই চূড়ান্ত ধাপে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়ন করা হয়, যাতে নতুন নতুন ফসল ও কৃষি পণ্য যেমন যুক্ত হতে পারে, তেমনি আবার কোনো ফসল ও পণ্য বাদও পড়তে পারে।

বাজেটিং

বাজেটিং হচ্ছে খামারের বৈষয়িক ও আর্থিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়।

বাজেটিং হচ্ছে খামারের বৈষয়িক ও আর্থিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। বাজেটে খামার পরিচালক তার খামার ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করে থাকে। বাজেটিং দুই প্রকারের হতে পারে যেমন- (ক) পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও (খ) আংশিক বাজেট।

(ক) পূর্ণাঙ্গ বাজেট : পূর্ণাঙ্গ বাজেটে গোটা খামারের সকল ফসল ও পণ্যদ্রব্যের সম্ভাব্য আয় ব্যয় নিরূপণ করা হয়। যেমন, একটি মিশ্র খামারের ক্ষেত্রে ফসল, হাঁসমুরগী, গবাদিপশু, দুধ, ফলমূল, শাকসব্জি ও মাৎস্য চাষ এসব কিছুরই আয়-ব্যয়ের বিবরণ তৈরি করা হয় এবং তদনুযায়ী খামারের কোথায় কতটুকু কী পরিবর্তন করলে লাভ বেশি হবে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়।

(খ) আংশিক বাজেট : আংশিক বাজেটে খামারের উৎপাদন প্রক্রিয়া মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে দুই একটি ক্ষেত্রে আংশিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। আংশিক বাজেটে সাধারণত (১) কোনো ফসলের উৎপাদন বাড়ানো, বা (২) নতুন কোনো ফসল বা পণ্য উৎপাদন, যেমন- ফসলের সাথে মাছের চাষ, অথবা (৩) কোন ফসল বা পণ্য একেবারে বাদ দেয়া, বা (৪) নতুন কোনো খামার যন্ত্র যেমন- পাওয়ার টিলার বা শ্যালো টিউবওয়েল কেনা বা ভাড়া করার বিষয় উল্লেখ থাকে। একটি সহজ কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে আংশিক বাজেটের বিষয়টি নিচে তুলে ধরা হলো :

আংশিক বাজেটে খামারের উৎপাদন প্রক্রিয়া মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে দুই একটি ক্ষেত্রে আংশিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

সমস্যা : ধরা যাক, ক-কৃষক ৫ একর জমিতে আউশ ধান, ৬ একরে আমন ধান ও ২ একরে রবিশস্য হিসাবে ডাল উৎপাদন করে আসছে। কিন্তু, এক দিকে বন্যায় ধান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপর দিকে গুড়ের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে ক-কৃষক এখন ৪ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করে অবশিষ্ট জমিতে আউশ ও আমন ধান করার কথা ভাবছে। ক-কৃষক আমাদের কাছে জানতে চায়, তার এ সিদ্ধান্ত মোট খামার আয়ের দিক থেকে লাভজনক হবে কিনা। এক্ষেত্রে আমরা আংশিক বাজেটের সাহায্য নিতে পারি, যা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো :

সারণি ৪.২.১ : আংশিক বাজেটের সাহায্যে আউশ, আমন ও ডাল বনাম ইক্ষু চাষের লাভ লোকসানের একটি কাল্পনিক হিসাব।

১. ইক্ষু থেকে বাড়তি আয়	টাকা
ক. ইক্ষু গুড়	১০,০০০
খ. ইক্ষুর ছোবড়া	২,০০০
গ. ইক্ষুর মোথা	১,০০০
ঘ. ইক্ষুর বীজ কাটিং	১,০০০
মোট	১৪,০০০
২. আগের তুলনায় কম জমিতে ধান ও ডাল করায় যে পরিমাণ খরচ কমে যাবে	টাকা
ক. ধান ও ডালের বীজ	২,০০০
খ. শ্রমিকের মজুরি :	
আউশ ধান	১,০০০
আমন ধান	৬০০
ডাল	২০০
গ. সার	১,০০০
ঘ. মূল্যাবনতি	৫,০০
ঙ. অন্যান্য	৫,০০
মোট	৫,৮০০
৩. সর্বমোট আয় (ক্রেডিট) (১+২)	১৯,৮০০
৪. ইক্ষু চাষের জন্য বাড়তি খরচ	টাকা
ক. ইক্ষু বীজ কাটিং	২,০০০
খ. শ্রমিকের মজুরি	৪,০০০
গ. ইক্ষু কল ভাড়া	২,০০০
ঘ. জ্বালানী ও খড়ি	২,০০০
ঙ. গুড় তৈরির সরঞ্জাম ও টিন	২,০০০
চ. চুলার উপর চালা	১,০০০
ছ. অন্যান্য	১,০০০
মোট	১৪,০০০
৫. কম জমিতে ধান ও ডাল করায় যে পরিমাণ আয় কমে যাবে	টাকা
ক. আউশ ধান	২,০০০
খ. আমন ধান	৫,০০০
গ. ডাল	১,০০০
মোট	৮,০০০
৬. সর্বমোট ব্যয় (ডেবিট) (৪+৫)	
৭. পার্থক্য (নিট আয়ের পরিবর্তন) (৬-৩)	২,২০০

উপরোক্ত আংশিক বাজেট থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক-কৃষক তার আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী (৫ একরে আউশ ধান, ৬ একরে আমন ধান ও ২ একরে ডাল উৎপাদন না করে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ একরে ইক্ষু ও বাকী জমিতে আউশ, আমন ও ডাল করলে নিট ২,২০০ টাকা লোকসান হবে। কাজেই, আর্থিক ও বৈষয়িক বিবেচনায় প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী খামারের কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়।



অনুশীলন (Activity) : আপনার নিজস্ব খামারে চলতি বৎসরের আমন মৌসুমে দু'টি ফসল পরিবর্তন করতে চান। এই পরিবর্তন যৌক্তিক কিনা তা বাজেটিং এর মাধ্যমে দেখান।

সারমর্ম : খামার পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে কৃষকের সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে লাভজনক ফসল, পণ্য, প্রযুক্তি বা উপকরণগুলোকে বেছে নেয়া ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা। খামার পরিকল্পনার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। বাজেটিং হচ্ছে খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব। বাজেটিং দুই প্রকারের, যথা: পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও আংশিক বাজেট।



পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. আংশিক বাজেট বলতে বোঝায়-

- জমির কোনো অংশের আবাদে হিসাব নিকাশ করা
- বছরের কোনো এক মৌসুমে একটি ফসলের কম বেশি করা
- ফসল পরিক্রমায় পরিবর্তন আনা
- অন্যসব অপরিবর্তিত রেখে খামারের দুই একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা।

খ. আংশিক বাজেটে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে না -

- কোনো ফসলের আবাদ বাড়ানো
- কোনো ফসলের আবাদ কমানো
- কোনো ফসল আগেভাগে বিক্রি করে দেয়া
- কোনো নতুন ফসল আবাদ করা।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. খামার পরিকল্পনা হচ্ছে।

খ. খামারের বৈষয়িক ও আর্থিক পরিকল্পনাই হলো।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. খামার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো লাভ বেশি করা।

খ. সুষ্ঠু খামার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একাধিক ধাপের প্রয়োজন।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. খামার পরিকল্পনা প্রণয়নের তৃতীয় ধাপে কী করা হয়?

খ. আংশিক বাজেটে কীসের সুপারিশ করা হয়?



পাঠ ৪.৩ খামার স্থাপন

এই পাঠ শেষে আপনি--

- আধুনিক খামার ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন।
- খামার স্থাপনে একজন খামার মালিকের কী কী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা বলতে পারবেন।
- খামার স্থাপনে ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- খামার স্থাপনে কী কী অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হয় সে সম্পর্কেও বর্ণনা করতে পারবেন।



আধুনিক খামার ব্যবস্থা

কৃষি একটি অতি পুরাতন পেশা। অননুত দেশে কৃষি খামার থেকে যে আয় হয় তা অন্যান্য পেশার তুলনায় খুব কম। তাই মানুষ বংশ পরস্পরায় এ পেশায় টিকে থেকেছে কেবল পারিবারিক খাদ্যের যোগান ও ভরণপোষণের জন্য। সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ খুব পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য বিধায় সামাজিকভাবেও তা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তারপর, বানবন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, পোকাকার আক্রমণ - এসব প্রাকৃতিক ঝুঁকি তো আছেই।

আধুনিক খামারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে (ক) নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়; (খ) পশু শ্রম ও মানুষের দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার হয়; (গ) পুঁজি ও শ্রমের একক প্রতি উৎপাদন বেশি হয় এবং (ঘ) উৎপাদন দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। তাই, বর্তমানে অনেকেই, এমনকি শিক্ষিত মানুষও বাণিজ্যিকভাবে খামার ব্যবসাকে লাভজনক পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে। দিন দিনই উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন, হাঁসমুরগী পালন, দুগ্ধ খামার, মাৎস্য চাষ, ইত্যাদি বৃদ্ধিলাভ করছে এবং অনেক শিক্ষিত যুবক এসব পেশাকে স্ব-কর্ম সংস্থানের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিচ্ছে। মোট কথা, সনাতন কৃষি বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিণত হচ্ছে এবং কৃষি খামার লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গড়ে উঠছে।

খামার স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়াদি

খামার ব্যবসাকে একটি পেশা হিসাবে বেছে নেয়া এবং নতুন করে খামার স্থাপনের জন্য প্রাধান্যত: তিন ধরনের বিষয়ে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

প্রথমত : খামার মালিক বা পরিচালকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন- শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, বয়স ও স্বাস্থ্য এবং রুচি ও চাহিদা।

দ্বিতীয়ত : ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ, যেমন- মাটির ধরন, আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভূমির উচ্চতা, ইত্যাদি।

তৃতীয়ত : অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ যার মধ্যে পড়ে উন্নত প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, উপকরণ সরবরাহ ও দাম, পুঁজি ও ঋণদান ব্যবস্থা, শ্রমের যোগান, জমির দাম, কৃষি পণ্যের পরিবহণ, বিপণন ও দাম, ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা : আধুনিক খামার পরিচালনার জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এ দুটোরই দরকার। কেবল অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে খামার ব্যবস্থাপকের শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। আধুনিক উপকরণের ব্যবহার, খামারের হিসাব-নিকাশ করা, ব্যাংকের সাথে লেনদেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে যোগাযোগ, ইত্যাদি কাজে শিক্ষিত কৃষকদের খুবই সুবিধা হয়।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে খামার ব্যবস্থাপকের শিক্ষার খুবই প্রয়োজন।

দেশে ইদানিং বহু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। যাতে সময়ের সাথে সাথে কৃষি প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উন্নততর ধারণা ও জ্ঞান লাভ করা যায়।

২. প্রশিক্ষণ : কেবল পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও আধুনিক কৃষি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে বাস্তব প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, হাঁসমুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, মাৎস্য খামার, নার্সারী, ইত্যাদি স্থাপন করার জন্য খামার ব্যবস্থাপকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। এজন্যে দেশে ইদানিং বহু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। যাতে সময়ের সাথে সাথে কৃষি প্রযুক্তি ও খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উন্নততর ধারণা ও জ্ঞান লাভ করা যায়।

৩. খামার ব্যবস্থাপকের বয়স ও স্বাস্থ্য : খামার স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে খামার ব্যবস্থাপকের অনুকূল বয়স ও স্বাস্থ্য থাকা প্রয়োজন। খামার ব্যবসা এমনিতেই শ্রমসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই দক্ষতা ও সফলতার সাথে খামার সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজ সময়মত সম্পন্ন করার জন্য খামার ব্যবস্থাপকের সাধারণত তরুণ বা মধ্যবয়সী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. খামার ব্যবস্থাপকের রুচি ও চাহিদা : কোন্ উদ্যোক্তা কী ধরনের খামার স্থাপন করবে তা তার রুচি ও চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, কারও ব্যক্তিগত ঝোঁক ও রুচি থাকতে পারে মাৎস্য চাষের প্রতি, তাই সে মাৎস্য খামার স্থাপনের উদ্যোগ নিবে। আবার কারও আগ্রহ হাঁস মুরগী পালনের প্রতি, ফলে সে আধুনিক হাঁস মুরগীর খামার করে বিভিন্ন উন্নত জাতের হাঁস মুরগী পালন করবে।

ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ

১. অবস্থান : সাধারণত শহর, বন্দর ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আশে পাশে খামার গড়ে ওঠে। তবে, বড় বড় সড়ক ও কলকারখানার একেবারে নিকটে খামার স্থাপন করা উচিত নয়। যেমন, যানবাহন ও কলকারখানার ধুলোবালি, ধূয়া ও বর্জ্য দ্রব্য, হাঁস মুরগী, গবাদিপশু ও মাছের খামারে ব্যাপকভাবে রোগব্যাদি ছড়াতে পারে।

২. মাটির ধরন : শস্য খামার স্থাপনের জন্য উর্বরা ও পানি নিষ্কাশিত জমির খুব প্রয়োজন। অনুর্বর মাটিতে ফসল ভালো হয় না বলে শস্য খামার করা মোটেই লাভজনক নয়। এসব জমিতে হাঁস মুরগীর খামার করা যায়। এমনকি পুকুর কেটে মাছের চাষ করাও অধিক লাভজনক হতে পারে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের কৃষি খামার গড়ে ওঠে।

৩. আবহাওয়া ও জলবায়ু : খামার স্থাপনের জন্য অনুকূল জলবায়ু ও আবহাওয়ার দরকার। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের কৃষি খামার গড়ে ওঠে। যেমন, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম এবং শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে বলে ঐ অঞ্চলে গমের আবাদ বেশি হয়।

৪. ভূমির উচ্চতা : খামার স্থাপনের জন্য জমির উচ্চতা এবং সেই কারণে বন্যার প্রকোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত উচ্চ ভূমি, যেখানে স্বাভাবিক বন্যায় পানি ওঠেনা, হাঁস মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, শাক-সজির খামার ও নার্সারী স্থাপনের জন্য খুব উপযোগী। অপর দিকে, নিম্নাঞ্চলে মাৎস্য খামার স্থাপন করা লাভজনক।

অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ

১. উন্নত প্রযুক্তির প্রাপ্যতা : ধান, গম, মাছ, ডিম, দুধ সহ কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন কতটা হয়েছে এবং কত সহজে তা পাওয়া যায় তার ওপর কৃষি খামার স্থাপন নির্ভর করে। যেমন, বর্তমানে অধিক পরিমাণে ডিম দেয় এমন উন্নত জাতের হাঁস মুরগী, বেশি বেশি দুধ দেয় এমন উন্নত জাতের গাভী, বা অল্পদিনেই দ্রুত বাড়ে এমন উন্নত জাতের মাছের পোনা সহজে পাওয়া যায় বলে বহু উদ্যোক্তা হাঁস মুরগী, দুগ্ধ ও মাৎস্য খামার স্থাপন করতে আগ্রহী হচ্ছে।

২. উপকরণ সরবরাহ ও দাম : কৃষি খামার স্থাপনের লক্ষ্যে, আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এবং ন্যায্য দামে উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। কোনো কোনো উপকরণ দামের ওপর কিছুটা ভর্তুকি থাকলে নতুন নতুন উদ্যোক্তারা খামার স্থাপনে বেশি আগ্রহী হয়।

৩. পুঁজি ও ঋণদান ব্যবস্থা : খামার ব্যবসা বেশ ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য নতুন নতুন খামার স্থাপন ও সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভূমিকা অপরিসীম। সময় মত সহজ শর্তে নির্বজ্ঞাটে ঋণ পাওয়া যায়না বলে লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও অনেকে খামার স্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৪. শ্রমের যোগন : আধুনিক খামার স্থাপন ও এর উৎপাদন কাজ পরিচালনার জন্য দক্ষ শ্রমিকের যোগান থাকা প্রয়োজন। এজন্য খামার শ্রমিকদেরও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

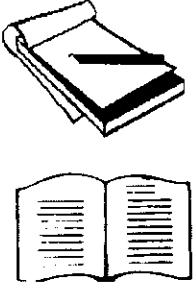
৫. জমির দাম : খামার স্থাপনের জন্য জমির প্রয়োজন। তাই যেসব অঞ্চলে জমির দাম তুলনামূলকভাবে কম সেখানেই সাধারণত খামার গড়ে ওঠে। অবশ্য সেখানে ভালো পরিবহন ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

পণ্যসামগ্রী ভালো বাজার দাম পেলে ওগুলো উৎপাদন করতে নতুন নতুন খামার গড়ে ওঠে।

৬. কৃষি পণ্যের পরিবহণ, বিপণন ও দাম : কৃষি খামারে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সহজেই পচে যায়। তাই যেখানেই খামার স্থাপন করা হবে, সেখান থেকে যেন পণ্য সামগ্রী দ্রুত অন্যত্র পরিবহন করা যায়। পণ্যসামগ্রী ভালো বাজার দাম পেলে ওগুলো উৎপাদন করতে নতুন নতুন খামার গড়ে ওঠে। কাজেই খামার স্থাপনের আগে উদ্যোক্তারা খামারে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উত্তম পরিবহণ, সুষ্ঠু বিপণন ও ন্যায্য দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়।

অনুশীলন (Activity) : আপনি ১০ বিঘা জমিতে একটি আদর্শ কৃষি খামার স্থাপনের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা আলোচনা করুন।

সারমর্ম : উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় নতুন নতুন খামার স্থাপন করতে অনেকেই এগিয়ে আসছে। অনেক শিক্ষিত যুবক স্ব-কর্ম সংস্থানের উপায় হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, মাৎস্য খামার ইত্যাদি স্থাপনে আগ্রহ দেখাচ্ছে। খামার স্থাপনে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয় তার মধ্যে পড়ে খামার মালিকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, খামারের ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং খামারের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ।





পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. আধুনিক খামারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়
- নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়
- অনেক জায়গা নিয়ে খামার করা হয়
- বহু শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হয়।

খ. খামার স্থাপনে যে অর্থনৈতিক বিষয়টি মোটেই বিবেচ্য নয় তাহলো-

- জমির দাম
- শ্রমের যোগান
- পুঁজি ও ঋণদান ব্যবস্থা
- খামার মালিকের স্থাবর সম্পত্তি।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ খুব ও।

খ. খামার স্থাপনের জন্য খামার মালিকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকার দরকার।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. খামার স্থাপনে বিবেচ্য ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমিক্ষয় অন্যতম।

খ. কৃষি খামারে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজেই পঁচে না।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. আধুনিক খামারে পুঁজি ও শ্রমের কী হয়?

খ. খামার মালিকের বয়স ও স্বাস্থ্য কীরূপ হওয়া উচিত?



পাঠ ৪.৪ খামারের রেকর্ড প্রণয়ন

এই পাঠ শেষে আপনি--

- খামার রেকর্ড বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- খামার রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- খামারের রেকর্ড কত প্রকার ও কী কী তাও জানতে পারবেন।



খামারের রেকর্ড কী?

খামারের রেকর্ড বলতে কোনো খামারের দৈনন্দিন আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে বোঝায়। খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খামারের রেকর্ড রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

খামারের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা :

খামারের রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ খামার মালিককে অনেক ভাবে সাহায্য করে। যেমন :

- ক. খামার রেকর্ড থেকে খামারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি ও বস্ত্রসামগ্রী এবং লাভ লোকসান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।
- খ. এসব তথ্যের ভিত্তিতে খামার মালিক তার খামারের লাভালাভকে একই ধরনের অন্যান্য খামারের লাভালাভের সঙ্গে তুলনা করতে পারে।
- গ. খামারের রেকর্ড থেকে ধার দেনা, ঋণ ও দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।
- ঘ. খামারের রেকর্ড রাখলে এর থেকে ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, চৌকিদারী কর পরিশোধ বা বকেয়া সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় এবং
- ঙ. বছরে বছরে খামারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বা খামারের ফল ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভ করা যায়।

ক্যাশ বই হচ্ছে দৈনন্দিন আর্থিক আদান প্রদানের হিসাব।

খামার রেকর্ডের প্রকারভেদ

খামারের রেকর্ড প্রণয়নের সবচেয়ে প্রচলিত উপায় হচ্ছে “ক্যাশবই” রাখা। ক্যাশ বই হচ্ছে দৈনন্দিন আর্থিক আদান প্রদানের হিসাব। সাধারণত একটি ক্যাশবইতে থাকে তারিখের ঘর, যার বিপরীতে পর্যায়ক্রমে ঘরগুলোতে থাকে ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা পাওনার বিবরণ, নগদ পাওনা, নগদ প্রদান এবং জমা।

খামারের রেকর্ডগুলোকে প্রধানত: তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, (ক) খামারের ইনভেন্টরি (খ) খামারের আর্থিক রেকর্ড এবং (গ) খামারের উৎপাদন সংক্রান্ত রেকর্ড।

(ক) খামারের ইনভেন্টরি :

খামারের ইনভেন্টরি বলতে টাকার অংকে খামারের সমুদয় সম্পদ ও দায়দেনার আর্থিক হিসাবকে বোঝায়। খামার ইনভেন্টরিতে সাধারণত দু’টি কলামে আর্থিক বিবরণ দেয়া হয়। বাম দিকের কলামে দেখানো হয় খামারের যাবতীয় সম্পদ ও ডান দিকের কলামে দেখানো হয় খামারের সকল প্রকার দায় দেনা। খামারের সম্পদ দুই প্রকার- চলতি সম্পদ ও মেয়াদী সম্পদ। চলতি সম্পদ বলতে বোঝায় হাতে নগদ টাকার পরিমাণ, ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ, অন্যের কাছে পাওনা টাকার পরিমাণ, বিক্রয়যোগ্য ফসল ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান, সার, বীজ, মেশিনের তেল বাবদ যদি অগ্রিম প্রদান করা হয়ে থাকে তার পরিমাণ ইত্যাদি। মেয়াদী সম্পদ বলতে বোঝায় জমি, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, খামারের মাছ, গাছপালা ইত্যাদির মূল্য হিসাবে মোট কত টাকা আছে।

মেয়াদী সম্পদ বলতে বোঝায় জমি, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, খামারের মাছ, গাছপালা, ইত্যাদির মূল্য হিসাবে মোট কত টাকা আছে।

অপরদিকে, খামারের দায়-দেনার মধ্যে পড়ে জমি বন্ধকী দেয়া থাকলে বন্ধকী টাকার পরিমাণ, অন্যের কাছে দেনার পরিমাণ, বকেয়া কর ও খাজনা, অন্যান্য প্রদেয় কর বা চাঁদা।

খামারের কিছু বিশেষ ইন্ডেন্টরিও থাকে। যেমন, খামার যন্ত্রপাতি বা গবাদিপশুর ইন্ডেন্টরি। এসব ইন্ডেন্টরিতে খামারের যন্ত্রপাতির নাম বা গবাদিপশুর প্রকারভেদ, এগুলোর সংখ্যা, বর্তমান মূল্য, সম্ভাব্য জীবনকাল, অবশিষ্ট মূল্য, ইত্যাদি দেয়া থাকে। এ গুলো থেকে যন্ত্রপাতির বাৎসরিক অবচয়ন বা বাৎসরিক খরচ নিচের ফর্মুলা অনুযায়ী নির্ণয় করা যায়।

$$\text{বাৎসরিক অবচয়ন} = \frac{\text{বর্তমান মূল্য}-\text{অবশিষ্ট মূল্য}}{\text{সম্ভাব্য জীবনকাল}}$$

(খ) আর্থিক রেকর্ড

খামারের আর্থিক রেকর্ড বলতে খামারের এক বছরের সকল আয় ও সকল ব্যয়ের বিবরণকে বোঝায়। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক খরচকে খামারের খরচ থেকে পৃথক করে রাখতে হবে। নিচে একটি আর্থিক রেকর্ডের নমুনা দেয়া হলো।

খামারের আর্থিক রেকর্ড বলতে খামারের এক বছরের সকল আয় ও সকল ব্যয়ের বিবরণকে বোঝায়।

আয় (টাকা)		ব্যয় (টাকা)	
ফসল বিক্রি	১০,০০০	বীজ ক্রয়	২,০০০
গবাদিপশু বিক্রি	৫,০০০	সার ক্রয়	২,৫০০
হাঁস মুরগী বিক্রি	১,০০০	গবাদিপশু ক্রয়	৪,০০০
জমির বর্গাভাগ	২,০০০	শ্রমিকের মজুরি	৪,০০০
সেচ পানি বিক্রি	৩,০০০	সেচ পানির দাম	৩,০০০
ফলমূল বিক্রি	১,০০০	পাওয়ার টিলার ভাড়া	১,০০০
অন্যান্য	১,০০০	জমির খাজনা	৫০০
		অন্যান্য	১,০০০
		মোট	১৮,০০০
		উদ্ধৃত	৫,০০০
	২৩,০০০		২৩,০০০

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে খামারের আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে ফসল, গবাদিপশু, হাঁস মুরগী, বর্গাভাগ, ফলমূল বিক্রি ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়েছে। অপর দিকে, ব্যয়ের খাতে যাবতীয় উপকরণের খরচ ও জমির খাজনা ধরা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে খামারের ৫০০০ টাকা উদ্ধৃত আয়কে ব্যয়ের কলামে দেখিয়ে আয় ও ব্যয়ের হিসাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

(গ) খামারের উৎপাদন সংক্রান্ত রেকর্ড :

খামারের উৎপাদনসংক্রান্ত রেকর্ডে প্লট অনুসারে ফসলের হিসাব রাখা হয়। এই রেকর্ডে থাকে প্রতিটি প্লটের মাটির ধরন, জমির উচ্চতা, জমির পরিমাণ, সারা বছরের ফসলচক্র, প্রত্যেক ফসলের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন কাজ ও উপকরণের পরিমাণ, ফসলের ফলন, ইত্যাদির বিবরণ। এসব তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যায় এবং তার ওপর ভিত্তি করে খামারের মোট আয় ব্যয় হিসাব করা হয়।

অনুশীলন (Activity) : একটি খামারের বিভিন্ন রেকর্ডসমূহ কীভাবে রাখবেন তার একটি নমুনা ছক তৈরি করুন।



সারমর্ম : খামারের রেকর্ড বলতে কোনো খামারের দৈনন্দিন খরচ ও আয়ের হিসাবকে বোঝানো হয়। খামারের রেকর্ডভুক্ত তথ্য ব্যবহার করে খামারের বাৎসরিক আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা যায়। প্রধান প্রধান খামার রেকর্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে- (ক) খামারের ইন্ডেন্টরি, (খ) খামারের আর্থিক রেকর্ড এবং (গ) খামারের উৎপাদন সংক্রান্ত রেকর্ড।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. খামারের রেকর্ড বলতে বোঝায় -
- খামারের যাবতীয় খরচের বিবরণ
 - খামারের যাবতীয় আয়ের বিবরণ
 - খামারের আয়-ব্যয়ের বিবরণ
 - খামারের ফসলের ফলনের বিবরণ।

খ. খামারের রেকর্ড রাখা প্রয়োজন কারণ-

- কৃষি কর কমানো যায়
- আয়কর দিতে হয় না
- খামারের লাভালাভকে অন্য খামারের সাথে তুলনা করা যায়
- খামারে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা সহজ হয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. দৈনন্দিন আর্থিক আদান-প্রদানের হিসেব এ রাখা হয়।
- খ. খামারের বিশেষ ইনভেন্টরি হলো বা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. খামারের চলতি সম্পদ এর মধ্যে জমির খাজনা অগ্রগণ্য।
- খ. খামারের রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ খামার মালিককে অনেকভাবে সাহায্য করে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

- ক. খামারের আর্থিক রেকর্ডে কী থাকে?
- খ. বাৎসরিক অবচয়ন নির্ণয়ের সূত্র কী?



পাঠ ৪.৫ শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জমির উচ্চতা, বন্যার প্রকোপ ও মাটির ভিন্নতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- আরও জানতে পারবেন প্রধান প্রধান ফসল পরিক্রমা সম্পর্কে।



বাংলাদেশের শস্য ও অন্যান্য ফসল

বাংলাদেশে ১০০টির বেশি ফসল উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ধান, গম ও পাট এ তিনটি ফসলই প্রায় ৮৫ ভাগ জমিতে আবাদ করা হয়। এ ছাড়া, শাকসজির আবাদ হয় প্রায় ২ ভাগ জমিতে, মশলা জাতীয় ফসল হয় প্রায় ২ ভাগ জমিতে এবং ফলমূলের চাষ হয় প্রায় ২ ভাগ জমিতে। উৎপাদনের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং শহরাঞ্চলে এগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইদানিং নতুন নতুন শাকসজি, তরিতরকারী, ফলমূল ও ফুলের চাষ বেড়ে যাচ্ছে।

জমির উচ্চতা, মাটির ধরন ও ফসল প্রকৃতি

জমির উচ্চতা অনুসারে বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে পাঁচটি ভাগে করা হয়। যেমন :

১. উঁচু জমি : এসব জমিতে ০-৩০ সে.মি. পর্যন্ত বন্যার পানি উঠতে পারে। এসব জমিতে বর্ষা মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ধান করা যায়।
২. মাঝারি উঁচু জমি : এসব জমিতে ৩০-৯০ সে.মি. পর্যন্ত বন্যা হয় এবং সাধারণত দেশী আউশ ও রোপা আমন ধান হয়।
৩. মাঝারি বিচু জমি : ৯০-১৮০ সে.মি. পর্যন্ত বন্যা হয়। প্রধানত: বোনা আউশ ও বোনা আমন ধান হয়।
৪. নিচু জমি : এ ধরনের জমিতে ১৮০-৩০০ সে.মি. পর্যন্ত বন্যা হয়। বর্ষা মৌসুমে প্রধানত: বোনা আমন ধান হয়।
৫. অতি নিচু জমি : এসব জমিতে ৩০০ সে.মি. এর বেশি বন্যার পানি ওঠে বলে সাধারণত বর্ষা মৌসুমে কোনো ফসল করা সম্ভব হয় না।

কোন জমিতে কী কী ফসল করা হবে তা কেবল জমির উচ্চতা বা বন্যার প্রকোপের ওপর নির্ভর করে না, মাটির ধরনও গুরুত্বপূর্ণ।

কোন জমিতে কী কী ফসল করা হবে তা কেবল জমির উচ্চতা বা বন্যার প্রকোপের ওপর নির্ভর করে না, মাটির ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মাটিকে ফসল উৎপাদনের দিক থেকে ১৭টি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে বন্যা বিধৌত মাটিই বেশি, যা প্রধানত: এটেল, দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি। এসব জমিতে কমবেশি সব ধরনের ফসল উৎপাদন করা যায়।

শস্য পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

খামারের বিভিন্ন জমিতে একজন কৃষক কী কী ফসল করবে তা যেমন প্রাকৃতিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তেমনি কৃষকের পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ, খাদ্য চাহিদা, শ্রম ও পুঁজির সংস্থান, আর্থিক সঙ্গতি, ইত্যাদিও বিবেচনায় নিতে হয়।

সাধারণভাবে শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক বাজেটিং পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়। আরও বৈজ্ঞানিক ও সঠিকভাবে শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করতে হয় লিনিয়ার প্রোগ্রামিং পদ্ধতি। তবে, সম্ভাব্য ফসলগুলো নির্বাচন করতে তথা শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে প্রধানত: নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে হয়।

আমাদের দেশে শস্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা যায় না।

(ক) পরিবারের খাদ্য চাহিদা : উন্নত দেশের কৃষিতে শস্য পরিকল্পনা করতে হয় বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। যে ফসলের লাভ বেশি, সেটাকেই বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিক্রমায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু, আমাদের দেশে শস্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা যায় না। কারণ, ধান বা গম উৎপাদন শাকসজি ও তরিতরকারির তুলনায় কম লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কৃষকদেরকে খাদ্য শস্য বেশি করে আবাদ করতে হয়। অর্থাৎ, শস্য পরিকল্পনায় আর্থিক লাভের চেয়ে পরিবারের জন্য বার্ষিক খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

(খ) কৃষকের মোট জমির পরিমাণ : কৃষকের জমির পরিমাণ কম, অর্থাৎ খামার ছোট হলে প্রায় সবটুকু জমিতেই ক্ষুদ্র কৃষকরা প্রধান খাদ্যশস্য ধান ও গমের আবাদ করবে। তেমনিভাবে, বড় কৃষকরা পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ ছাড়াও বিক্রির জন্যও খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে। অনেক বড় কৃষক আবার ফলন ও লাভ - দুটোই কম হওয়া সত্ত্বেও কেবল পরিবারের পছন্দ অনুযায়ী খাবারের জন্য কিছু জমিতে বিরই বা কালোজিরা জাতীয় সরুধান উৎপাদন করে থাকে।

(গ) পারিবারিক শ্রমের পরিমাণ : কোনো কৃষকের পরিবার থেকেই যদি যথেষ্ট শ্রমের যোগান দেয়া যায়, তবে সাধারণত শ্রম-ঘন ফসল যেমন, ইক্ষু, পাট, সজি, তরিতরকারী, ইত্যাদি বেশি আবাদ করা হবে।

(ঘ) উপকরণ খরচ ও পুঁজির পরিমাণ : আমাদের দেশের কৃষকদের নগদ পুঁজির পরিমাণ কম। তাই লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও তারা পুঁজির অভাবে অনেক ফসল করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ধান গমের তুলনায় সজি, তরিতরকারী, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে সার, সেচ, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ বাবদ অনেক বেশি নগদ খরচের প্রয়োজন পড়ে। তাই যাদের নগদ পুঁজি কম তাদের যথেষ্ট পারিবারিক শ্রমিক, উপযুক্ত জমি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ঐসব ফসল ফলাতে পারেনা।

(ঙ) ঋণের সংস্থান : পুঁজির ঘাটতি মেটানোর জন্যে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা হলে অনেক কৃষক ব্যয়বহুল কিন্তু লাভজনক ফসল উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে পারে। মহাজনী ঋণের সুদ অত্যধিক বেশি বলে অনেকেই ব্যাংক ঋণের আশায় থাকে।

(চ) আগাম জাতের ফসল : অনেক কৃষক, বিশেষ করে ছোট কৃষকরা, আগে ভাগেই যাতে পরিবারের জন্য খাবার পেতে পারে সেই লক্ষ্যে জমিতে আগাম জাতের ধান করে থাকে। এর ফলে, মৌসুমের শুরুতে দামও ভালো পাওয়া যায়। তরিতরকারীর বেলায়ও একই কথা খাটে।

কৃষকরা তাদের শস্য পরিকল্পনায় সাধারণত ঐসব ফসলকে বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলোর বাজার দাম পূর্ববর্তী বছরে ভালো ছিল।

(ছ) ফসলের দাম : কৃষকরা তাদের শস্য পরিকল্পনায় সাধারণত ঐসব ফসলকে বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলোর বাজার দাম পূর্ববর্তী বছরে ভালো ছিল। ঠিক তেমনিভাবে এবছর কৃষকরা যেসব ফসলের দাম কম পাবে, আগামী বছর সেই সব ফসল তারা কম করবে।

(জ) ফসলচক্র অনুসরণ করা : শস্য পরিকল্পনায় কৃষকরা এমন ফসলচক্র অনুসরণ করে, যাতে এক ধরনের ফসলের পর অন্য ধরনের ফসল করা যায় এবং তাতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। একই ধরনের ফসল একাদিক্রমে জন্মালে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়।

(ঝ) নগদ অর্থের চাহিদা : অনেক জমিতে খাদ্যশস্য না করে পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য অর্থকরী ফসল পাট, সরিষা, ডাল, পেঁয়াজ রসুন, তরিতরকারী, আলু, ইত্যাদি ফসলের আবাদ করে।

বার্ষিক ফসল পরিক্রমা

জমির উচ্চতার দিক থেকে ফসল পরিক্রমা ভিন্নতর হয়। মাঝারি উঁচু জমিতে যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রধান প্রধান ফসল পরিক্রমা নিম্নরূপ-

আলু - উফশী আউশ

উফশী বোরো - রবিশস্য

উফশী বোরো - রোপা আমন - সরিষা

গম - বোনা আউশ - রোপা আমন

বৃষ্টি নির্ভর জমিতে প্রধান ফসল পরিক্রমা নিম্নরূপ-

বোনা আউশ-আমন - রবিশস্য

গম - পাট/বোনা আউশ - রোপা আমন

আলু - পাট - রোপা আমন

বোনা আউশ - রোপা আমন - রবিশস্য



অনুশীলন (Activity) : আপনার এলাকার জমির ধরন উল্লেখ করণ। জমিতে কীভাবে শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন তা উল্লেখ করণ।

সারমর্ম : বাংলাদেশে ১৭ প্রকারের মাটি রয়েছে। উচ্চতার দিক থেকে উঁচু, মাঝারি উঁচু, মাঝারি নিচু, নিচু ও অতি নিচু এই ৫ ধরনের জমি রয়েছে। শস্য পরিকল্পনার জন্য জমির উচ্চতা, মাটির ধরন, বন্যার প্রকোপ, ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। এ ছাড়াও, পরিবারের খাদ্য চাহিদা, খামারের আকার, উপকরণ খরচ, পুঁজি ও ঋণের সংস্থান, ফসলের দাম, ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়গুলোও শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মাঝারি উঁচু জমিতে বন্যার পানির গভীরতা হচ্ছে-

- i. ০-৩০ সে.মি.
- ii. ৩০-৯০ সে.মি.
- iii. ৯০-১৮০ সে.মি.
- iv. ১৮০-৩০০ সে.মি.।

খ. অন্য ফসলের তুলনায় আমাদের দেশের কৃষকরা ধানই বেশি করে, কারণ-

- i. ধান উৎপাদন করা সহজ
- ii. ধান প্রধান খাদ্যের চাহিদা মেটায়
- iii. ধান অনেকদিন ধরে রাখা যায়
- iv. ধান খুব লাভজনক।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গমের প্রতিযোগী ফসল।

খ. পারিবারিক খাদ্য চাহিদা মেটাতে বেশি আবাদ করা হয়।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. আমাদের দেশে শস্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা যায় না।

খ. ইদানিং মোট আবাদি জমির ৮৫ ভাগ জমিতে শাকসজি ও তরিতরকারি চাষ করা হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কৃষকরা তাদের জমিতে অনেক লাভজনক ফসল চাষ করতে না পারার কারণ কী?

খ. কৃষক খামারে কী কী ফসল করবে তা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় কী?

পাঠ ৪.৬ খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ



এই পাঠ শেষে আপনি--

- খামারের বিভিন্ন খরচ ও আয়ের ধারণা লাভ করবেন।
- গড়পদ্ধতিতে কীভাবে বিভিন্ন ফসল ও পণ্যদ্রব্যের আয়-ব্যয় হিসাব করে সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রান্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করলে লাভ সর্বাধিক হবে, তাও শিখতে পারবেন।
- একটি খামার বিভিন্ন ফসল ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে বছর শেষে কী পরিমাণ আয় করে তা নিরূপণের পদ্ধতি শিখতে পারবেন।



খামারের আয় ব্যয়ের কতিপয় ধারণা

যে কোনো কৃষক বা খামার মালিকের খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা উচিত, যাতে বছর শেষে খামারের লাভ ক্ষতি কী হলো সে সম্পর্কে জানা যায়। এই ইউনিটের চতুর্থ পাঠে (৪.৪) খামারের রেকর্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ঐসব রেকর্ডের ভিত্তিতে কীভাবে খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব করা হয় তা আলোচনা করা হবে। খামারের আয় ব্যয় নিরূপণের জন্য অর্থনীতি শাস্ত্রের নিম্নলিখিত ধারণাগুলোর সাথে পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

খামারের খরচের ধারণা

(ক) খামারের স্থির খরচ : খামারের স্থির খরচ বলতে ঐসব খরচকে বোঝায় যেগুলো খামারে কিছু উৎপাদন না হলেও বহন করে যেতে হয়। অর্থাৎ, খামারের কোনো ফসল বা পণ্যদ্রব্য বেশি বা কম উৎপাদন হলে তার জন্য স্থির খরচগুলো কমবেশি হয় না। এ জন্যেই এসব খরচকে বলা হয় স্থির খরচ। বাংলাদেশের কোনো খামারের স্থির খরচগুলোর মধ্যে পড়ে : জমির খাজনা, খামার কাজে গৃহীত ঋণের সুদ, খামারের ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতির স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ, বাৎসরিক কামলার মজুরি, পারিবারিক শ্রমের দাম, গবাদিপশুর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ইত্যাদি।

(খ) খামারের পরিবর্তনীয় খরচ : খামারের কোনো ফসল বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনে যেসব খরচ করা হয় সেগুলোকে খামারের পরিবর্তনীয় খরচ বলা হয়। এসব খরচের মধ্যে পড়ে : বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ঔষধ, কেনা শ্রমিকের মজুরি, কলের লাঙ্গল বা সেচযন্ত্রের ভাড়া, কৃষি যন্ত্রপাতি ও ঘরদোর মেরামত খরচ, চলতি মূলধনের ওপর সুদ, ইত্যাদি। খামারের উৎপাদন কম বা বেশি হলে এগুলো খরচও কম বা বেশি হয় বলে এসব খরচকে পরিবর্তনীয় খরচ বলা হয়ে থাকে।

(গ) খামারের মোট খরচ : খামারের স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচের যোগফল হচ্ছে খামারের মোট খরচ। তাই, খামারের মোট উৎপাদন বাড়লে মোট খরচও বাড়ে এবং উৎপাদন কমলে মোট খরচও কম হয়।

খামারের আয়ের ধারণা

(ক) খামারের মোট আয় : খামারের মোট আয় বলতে এক বছরে খামারে উৎপাদিত সকল ফসল ও পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্যকে বোঝায় (বিক্রয় হোক বা না হোক)। এ জন্য খামারে উৎপাদিত প্রত্যেকটি ফসল বা পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্য হিসাব করে সবগুলো যোগ করলে খামারের মোট আয় পাওয়া যায়।

(খ) খামারের নীট আয় : খামারের মোট আয় থেকে মোট খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই খামারের নীট আয় বলা হয়। আমাদের মত দেশে কৃষকদের নগদ পুঁজির পরিমাণ কম থাকে বলে তারা নগদ খরচের ওপর কী পরিমাণ আয় হলো সেটাই বেশি হিসাব করে। এ জন্য নগদ খরচের ওপর খামারের যে আয় থাকে তাকে নগদ খরচাবশিষ্ট নীট আয় বলা হয়।

খামারের মোট আয় থেকে মোট খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই খামারের নীট আয় বলা হয়।

(গ) গ্রস মার্জিন : খামারে উৎপাদিত প্রত্যেকটি ফসল ও পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্য থেকে প্রত্যেকটির পরিবর্তনীয় খরচগুলোকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে গ্রস ফসল বা পণ্যদ্রব্যের গ্রস মার্জিন বলা হয়। বাস্তবে, ফসলের গ্রস মার্জিন ও ফসলের নগদ খরচাবশিষ্ট নীট আয় প্রায় সমান বলা যায়।

ফসলের আয় ব্যয় বিশ্লেষণ

খামারের কোন্ ফসল কী পরিমাণ লাভজনক হবে তা ফসলগুলোর আলাদা আলাদা আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ হতে জানা যায়। আয়-ব্যয় নিরূপণ গড়পদ্ধতি ও প্রান্তিক পদ্ধতি - দুইভাবেই করা যায়।

(ক) গড় আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ : গড় পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে ইরি-বোরো ও রোপা আমন এ দু'টি ফসলের তুলনামূলক আয়-ব্যয় নিরূপণ করা যায় তা নিচের সারণি ৪.৬.১ এ দেখানো হলো :

সারণি ৪.৬.১ : ইরি-বোরো ও রোপা আমন ধানের হেক্টর প্রতি গড় আয়-ব্যয়ের হিসাব।

আয় ও ব্যয়ের খাত	ইরি-বোরো		রোপা আমন	
	পরিমাণ	টাকা	পরিমাণ	টাকা
১. আয়				
ক. ফসল	৪ টন	২২০০০	৩.২ টন	১৭৬০০
খ. উপজাত	-	৯০৮	-	৯০৮
গ. মোট আয় (ক+খ)	-	২২৯০৮	-	১৮৫০৮
২. উপকরণ খরচ				
ক. পারিবারিক শ্রম	১০০ দিন	৫০০০	৮০ দিন	৪০০০
খ. কেনা শ্রম	১০০ দিন	৫০০০	৮০ দিন	৪০০০
গ. পারিবারিক পশু শ্রম	২০ জোড়া দিন	১৫০০	২০ জোড়া দিন	১৫০০
ঘ. কেনা পশু শ্রম	১২ জোড়া দিন	৯০০	১২ জোড়া দিন	৯০০
ঙ. ট্রাক্টর ভাড়া	-	৫০০	-	৩০০
চ. বীজ/চারার	-	১৫০০	-	১২০০
ছ. সার	৪০০ কেজি	২৮০০	২৫০ কেজি	১৭৫০
জ. কীটনাশক	২ বোতল	১৫০	১ বোতল	৭৫
৩. মোট খরচ (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)		১৭৩৫০		১৩৭২৫
৪. মোট পরিবর্তনীয় খরচ (খ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)		১০৮৫০		৮২২৫
৫. নীট আয় (১-৩)		৫৫৫৮		৪৭৮৩
৬. গ্রস মার্জিন (১-৪)		১২০৫৮		১০২৮৩

মোট আয় থেকে খরচ বাদ দিয়ে ফসলের হেক্টর প্রতি নীট আয় ও গ্রস মার্জিন বের করা হয়।

সারণি ৪.৬.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফসলগুলোর আয়ের খাত হিসাবে ফসলের পরিমাণ ও তার উপজাতের (যেমন, খড়) মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। অপরদিকে, উপকরণের খাতে সকল উপকরণের পরিমাণ ও তার মূল্য ধরে মোট খরচ ও মোট পরিবর্তনীয় খরচ বের করা হয়েছে। এরপর মোট আয় থেকে খরচ বাদ দিয়ে ফসলের হেক্টর প্রতি নীট আয় ও গ্রস মার্জিন বের করা হয়েছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে রোপা আমনের চেয়ে ইরি-বোরো ধানের মোট খরচ ও পরিবর্তনীয় বা নগদ খরচের পরিমাণ বেশি হলেও নীট আয় ও গ্রস মার্জিনও বেশি। এভাবে প্রতিযোগী ফসল, যেমন ইরি-বোরো ধান ও পাট বা গম ও সরিষা এ গুলোর তুলনামূলক আয় ব্যয় বিশ্লেষণ করে কোন্টি বেশি লাভজনক তা জানা যায় এবং কৃষক সেটিই উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(খ) প্রান্তিক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ

কোনো ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবর্তনীয় উপকরণ, যেমন সার কতটুকু ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, প্রান্তিক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ থেকে তা জানা যায়। অর্থাৎ, আমরা জানি যে সারের পরিমাণ বাড়তে থাকলে একটি মাত্রা পর্যন্ত ফলনও বাড়বে। কাজেই কৃষক জানতে চাইবে যে সারের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য যে বাড়তি খরচ হবে তা কি বাড়তি যে ফলন পাওয়া যাবে তার মূল্যের চেয়ে বেশি নাকি কম। একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

সারের ব্যবহার ও ধান উৎপাদনের

সারণি ৪.৬.২ প্রান্তিক আয় ও ব্যয়ের কাল্পনিক হিসাব

সার (কেজি)	ধান (কেজি)	সারের মোট খরচ (টাকা)	সারের প্রান্তিক খরচ (টাকা)	ধানের মোট আয় (টাকা)	ধানের প্রান্তিক আয় (টাকা)
৫	২০	৩৫	-	১৪০	-
৬	২২	৪২	৭	১৫৪	১৪
৭	২৩	৪৯	৭	১৬১	৭
৮	২৩	৫৬	৭	১৬১	০
৯	২১	৬৩	৭	১৪৭	-১৪

ইউনিট ২ এর ২.৪ পাঠে কৃষিতে যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ-বিধির আলোচনা করা হয়েছে, পাশের উদাহরণে তারই প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

সারণি ৪.৬.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষক ৫ কেজি থেকে আর ১ কেজি সার বেশি ব্যবহার করলে ২ কেজি ধান বেশি পায়। এই বাড়তি ১ কেজি সারের ব্যবহারের জন্যে সারের মোট খরচ ৩৫ থেকে ৪২ টাকা। অর্থাৎ ৭ টাকা বেড়ে যায়। এটাকে বলে সারের প্রান্তিক খরচ। কিন্তু এই বাড়তি ১ কেজি সার ব্যবহারের ফলে যে ২ কেজি ধান বেশি পাওয়া যায় তাতে কৃষকের মোট আয় ১৪০ থেকে ১৫৪ টাকা অর্থাৎ ১৪ টাকা বেড়ে যায়। এই ১৪ টাকা হচ্ছে প্রান্তিক আয়। যেহেতু এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি সেহেতু কৃষক আরও ১ কেজি সার ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু এবার অর্থাৎ ৭ কেজি সার ব্যবহার করলে দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক ব্যয় হয় ৭ টাকা এবং প্রান্তিক আয়ও হয় ৭ টাকা। এরপরও যদি কৃষক ৮ম কেজি সার ব্যবহার করে তার প্রান্তিক আয় হবে শূন্য অর্থাৎ বাড়তি সারের ফলে কোনো বাড়তি আয় আসছে না। ৯ম কেজি সার ব্যবহার করলে মোট ধান উৎপাদন আসলে ২ কেজি হ্রাস পাবে, অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক - ১৪ টাকা হবে। কাজেই একজন যুক্তিবাদী কৃষক ৭ কেজির বেশি সার ব্যবহার করবে না, কারণ এই ৭ কেজি সার ব্যবহার করলেই সারের ও ধানের এই দামে সারের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হবে এবং এতেই কৃষকের লাভ হবে সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য যে ইউনিট ২ এর ২.৪ পাঠে কৃষিতে যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধির আলোচনা করা হয়েছে, উপরোক্ত উদাহরণে তারই প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

খামারের আয়-ব্যয় নিরূপণ (অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি)

উপরে আমরা নির্দিষ্ট ফসলের আয় ব্যয় কীভাবে নিরূপণ করতে হয় তা শিখেছি। এখন আমরা সমগ্র আয়-ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। সারণি ৪.৬.১ এর ওপর ভিত্তি করে আরেকটি সহজ উদাহরণ দেয়া যায়। ধরা যাক, একজন কৃষকের মোট ১ হেক্টর জমি আছে। পুরো ১ হেক্টরে সে বোরো মৌসুমে ইরি-বোরো ধান করলো, আমন মৌসুমেও পুরো ১ হেক্টরে রোপা আমন করলো এবং রবি মৌসুমে মাত্র ০.৫ হেক্টরে সে সরিষা করলো। অবশিষ্টাংশ পদ্ধতিতে এই খামারের বাৎসরিক আয়-ব্যয় কীভাবে নিরূপণ করা যায় তা নিচের সারণি ৪.৬.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি ৪.৬.৩ : খামারের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় (অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি)

খাত	ইরি- বোরো	রোপা- আমন	সরিষা	মোট
ক. ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	১	১	০.৫	২.৫
খ. ফসলের মোট ভর (টাকা)	২২৯০৮	১৮৫০৮	৮৪০০	৪৯৮১৬
গ. মোট পরিবর্তনীয় খরচ (টাকা)	১০৮৫০	৮২২৫	২০৩০	২১১০৫
ঘ. গ্রস মার্জিন (টাকা) (খ-গ)	১২০৫৮	১০২৮৩	৬৩৭০	২৮৭১১
ঙ. স্থির খরচ (টাকা)	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০
চ. খামারের নীট আয় (টাকা) (ঘ-ঙ)				২৫৭১১
ছ. পারিবারিক শ্রমের আয় (টাকা) (১০০+৮০+২০) = ২০০ দিন×৫০				১০০০০
জ. খামার ব্যবস্থাপকের শ্রম, ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের আয় (চ-ছ)				১৫৭১১
ঝ. ব্যবস্থাপকের শ্রম (১০০ দিন×৫০)				৫০০০
ঞ. ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের আয় (জ-ঝ)				১০৭১১
ট. বিনিয়োগের আয় (পরিবর্তনীয় খরচের ওপর ৪ মাসের জন্য ১৮% সুদের হারে)				১২৬৬
ঠ. খামার ব্যবস্থাপনার জন্য অবশিষ্ট আয় (ঞ-ট)				৯৪৪৫

উপরের সারণি ৪.৬.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই খামারটি বছরে ২৮৭১১ টাকার গ্রস মার্জিন আয় করে। তার থেকে স্থির খরচ বাদ দিলে খামারের নীট আয় থাকে ২৫৭১১ টাকা এর থেকে পারিবারিক শ্রম বাবদ ১০,০০০ টাকা, ব্যবস্থাপকের শ্রম বাবদ ৫০০০ টাকা, এবং বিনিয়োগ খরচের ওপর সুদ হিসাবে ১২৬৬ টাকা বাদ দিলে ঐ খামারের ব্যবস্থাপনার জন্য আয় হিসাবে ৯৪৪৫ টাকা অবশিষ্ট থাকে।

অনুশীলন (Activity) : আপনার জমিতে লাগানো গমে কী পরিমাণ/কয়টি সেচ দিলে লাভজনক হবে তার একটি হিসাব দেখান।

সারমর্ম : খামারের আয়-ব্যয় নিরূপণের জন্যে কতিপয় অর্থনীতির ধারণা যেমন, খামারের স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচ, খামারের মোট ও নীট আয়, গ্রস মার্জিন, ইত্যাদি ধারণার সাথে পরিচয় থাকতে হয়। খামারের মোট আয় থেকে মোট খরচ বাদ দিলে নীট আয় এবং কেবল পরিবর্তনীয় খরচ বাদ দিলে গ্রস মার্জিন পাওয়া যায়। প্রান্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কী পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে তা জানা যায়। অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে খামারের বাৎসরিক গ্রস মার্জিন, নীট আয়, ব্যবস্থাপনার আয়, ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ১। খামারের স্থির খরচের মধ্যে পড়ে না-
 - ক. জমির খাজনা,
 - খ. যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি,
 - গ. বিয়ে-শাদী ও পারিবারিক ভরণপোষণের খরচ,
 - ঘ. পারিবারিক শ্রমের দাম।
- ২। খামারের গ্রস মার্জিন বলতে বোঝায়-
 - ক. মোট আয় থেকে মোট খরচ বাদ,
 - খ. মোট আয় থেকে পরিবর্তনীয় খরচ বাদ,
 - গ. মোট আয় থেকে স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচ বাদ,
 - ঘ. মোট আয় থেকে পারিবারিক শ্রমের দাম বাদ।
- ৩। উপকরণের ব্যবহার সবচেয়ে লাভজনক হবে যখন-
 - ক. উপকরণের প্রান্তিক খরচের চেয়ে প্রান্তিক আয় বেশি,
 - খ. উপকরণের প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান,
 - গ. উপকরণের প্রান্তিক খরচ স্থির ও প্রান্তিক আয় শূন্য,
 - ঘ. উপকরণের প্রান্তিক খরচ শূন্য ও প্রান্তিক আয় স্থির।
- ৪। খামারের নীট আয় বলতে বোঝায় মোট আয় থেকে-
 - ক. পারিবারিক শ্রমের দাম বাদ,
 - খ. স্থির খরচসমূহ বাদ,
 - গ. পরিবর্তনীয় খরচসমূহ বাদ,
 - ঘ. মোট খরচ বাদ।

ব্যবহারিক



পাঠ ৪.৭ শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শস্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যেসব উপাত্ত লাগে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবেন এবং শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ধাপগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন।

উপাত্ত



ভৌত ও জীববৈজ্ঞানিক উপাত্ত :

জমির পরিমাণ, মাটির ধরন, জমির উচ্চতা, বন্যার গভীরতা, পানি নিষ্কাশন ও সেচের ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার তারতম্য, ফসলের বিভিন্ন জাত, ইত্যাদি।

আর্থ-সামাজিক উপাত্ত :

পরিবারের খাদ্য চাহিদার পরিমাণ, আর্থিক সংগতি, ঋণের সংস্থান, পারিবারিক শ্রমের প্রাপ্যতা, হালগরু আছে কিনা, বিভিন্ন ফসলের জন্য উপকরণের পরিমাণ ও দাম, বিভিন্ন ফসলের দাম, পরিবহন ব্যবস্থা, বাজারের দূরত্ব, ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. কৃষকের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে শস্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করুন।
২. তার কাছ থেকে ভৌত ও আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সুবিন্যস্ত জরিপ ফর্ম তৈরি করুন।
৩. কৃষকের সুবিধা মত সময়ে তার কাছে গিয়ে জরিপ ফর্মে সবগুলো উপাত্ত লিপিবদ্ধ করুন।
৪. ইউনিট ৪ এর ৪.২ পাঠে বর্ণিত সারণি ৪.২.১ এর পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটির উপযুক্ততা অনুসারে সম্ভাব্য ফসলগুলোর আংশিক বাজেটিং করুন।
৫. আংশিক বাজেটিং এর ফল অনুসারে যেসব ফসলের আয় বেশি দেখা যায় সেগুলোকে শস্য পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করুন।
৬. নির্বাচিত ফসলগুলোকে ফসল পরিক্রমা অনুসারে সাজান এবং শিক্ষককে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিন।

পাঠ ৪.৮ খামারের রেকর্ড প্রণয়ন

এই পাঠ শেষে আপনি--

- একটি প্রচলিত ক্যাশ বই এর মাধ্যমে কীভাবে খামারের দৈনন্দিন আর্থিক আদান প্রদানের হিসাব রাখা হয় তা হাতে কলমে শিখতে পারবেন।



প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী : একটি ক্যাশবই, একটি ১২ ইঞ্চি লম্বা স্কেল ও কলম।

কাজের ধাপ

১. ক্যাশবই এর ওপর খামার মালিকের নাম এবং যে আর্থিক বছরের জন্য খামারের হিসাব রাখবেন তা উল্লেখ করুন।
২. ভেতরের পৃষ্ঠায় স্কেলের সাহায্যে ৫ টি পৃথক পৃথক ঘর টানুন এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নম্বর দিন।
৩. নিম্নলিখিত ছক অনুসরণ করে ১ম ঘরে তারিখ, ২য় ঘরে বিবরণ, ৩য় ঘরে নগদ পাওনা, ৪র্থ ঘরে নগদ প্রদান ও ৫ম ঘরে ব্যালেন্স বা জমা লিখুন।

তারিখ	বিবরণ	নগদ পাওনা	নগদ প্রদান	ব্যালেন্স /জমা
১.১.৯৮	আগের জমা	-	-	৫০০
৭.২.৯৮	১০ মণ ধান বিক্রয় ২০০ টাকা মণ দরে	২০০০	-	২৫০০
১০.২.৯৮	পাওয়ার টিলার ভাড়া	-	৩০০	২২০০
১৫.২.৯৮	২ মণ সরিষা বিক্রয়, ৬০০ টাকা মণ দরে	১২০০	-	৩৪০০
২৩.২.৯৮	বোরো ধানের চারা ক্রয়	-	৫০০	২৯০০
২০.৩.৯৮	শ্রমিকের মজুরি : ২০ দিন, ৫০ টাকা হিসাবে	-	১০০০	১৯০০
২৯.৩.৯৮	৫ মণ পাট বিক্রয়, ৩৫০ টাকা মণ দরে	১৭৫০	-	৩৬৫০
৩১.৩.৯৮	৫০ কেজি ইউরিয়া, ৭ টাকা দরে	-	৩৫০	৩৩০০

৪. এভাবে, পরবর্তী প্রত্যেকটি তারিখ অনুযায়ী নগদ পাওনা, নগদ প্রদান ও জমার অংকগুলো লিখে যান এবং শিক্ষককে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিন।



পাঠ ৪.৯ একটি বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি

এই পাঠ শেষে আপনি-

- একটি বাণিজ্যিক মাৎস্য খামার পরিদর্শন শেষে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা লিখতে পারবেন।



ক. প্রতিবেদনের নমুনা

শিরোনাম : রূপালী মাৎস্য খামার পরিদর্শনের ওপর একটি প্রতিবেদন।

১. গত ১৯৯৭ সালের ৮ই আগস্ট গাজীপুরের চন্দ্রায় অবস্থিত রূপালী মাৎস্য খামারটি পরিদর্শন করা হয়। খামারটিতে ২০ শতাংশ পরিমাণের ১টি পুকুর রয়েছে। এই পুকুরে কাতলা, রুই, সিলভার কার্প ও মৃগেল এই চার জাতের মাছের চাষ করা হয়। পুকুরে সব মিলে মোট ৬০০টি পোনা ছাড়া হয়েছে।
২. পোনা ছাড়ার আগে আগাছা পরিষ্কার ও রান্ধুসে মাছ অপসারণ করে পুকুর প্রস্তুত করা হয়েছে। পুকুর তৈরির আগে পুকুরটি একেবারে শুকিয়ে ফেলা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পুকুরে চুন ও সার প্রয়োগ করা হয়। পুকুরে পর্যাপ্ত পানি থাকার জন্য একটি অগভীর নলকূপ থেকে মাঝে মাঝে পানি সরবরাহ করা হয়। পোনার খাদ্য হিসাবে খৈল, কুড়া, ভুসি, ইত্যাদি সকাল বিকাল দুবার সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও, গোবর ও রাসায়নিক সারও প্রয়োগ করা হয়েছে।
৩. পোনা ছাড়ার ৭ মাসের মধ্যেই রুই, কাতলা ও মৃগেল ৭০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি এবং সিলভার কার্প ১-১.২ কেজি ওজন হয়েছে। সবগুলো মাছই ধরে বিক্রি করা হয়েছে।
৪. খামারের একটি মোটামুটি আয় ব্যয়ের হিসাব পাওয়া গেছে। পুকুর প্রস্তুতকরণ, শ্রমের মজুরি, পোনার দাম, চুন, সার ও কুড়ার খরচ, ইত্যাদি বাবদ খামারের মোট ব্যয় হয়েছে ৮০০০ টাকা। এর বিপরীতে ইতিমধ্যে পুকুর থেকে ২০০ কেজি মাছ প্রতি কেজি ১০০ টাকা হিসাবে মোট ২০,০০০ টাকা বিক্রি করা হয়েছে। এতে খামারের নীট আয় হয়েছে ২০,০০০ - ৮,০০০ = ১২,০০০ টাকা। মাৎস্য খামারের এ লাভ অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক বিধায় খামারের মালিক মাছ চাষের জন্য আরেকটি পুকুর খননের পরিকল্পনা নিয়েছে।
- খ. এভাবে কাল্পনিক একটি বাণিজ্যিক মুরগী খামার পরিদর্শনের ওপর প্রতিবেদন তৈরির চেষ্টা করুন।



পাঠ ৪.১০ একটি খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ

এই পাঠ শেষে আপনি--

■ নিজে নিজে যে কোনো খামারের বাৎসরিক আয় ব্যয় নিরূপণ করতে পারবেন।

কাজ : একটি খামারের আয়-ব্যয় নিরূপণ (অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে)

করণীয় :



১. নিচের সারণিতে একটি কাল্পনিক শস্য খামারের কতিপয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেয়া আছে। এগুলো ব্যবহার করে খামারের গ্রস মার্জিন ও নীট আয় বের করতে হবে। ইউনিট ৪ এর ৪.৬ পাঠের সারণি ৪.৬.৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিচের সারণির শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন।

খাত	আউশ	পাট	আমন	ডাল	মোট
ক. জমির পরিমাণ (হেক্টর)	২	০.৫	২	১	৫.৫
খ. ফসলের মোট আয় (টাকা)	৩০,০০০	৫,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০
গ. মোট পরিবর্তনীয় খরচ (টাকা)	১৫,০০০	৩,০০০	১২,০০০	১০,০০০
ঘ. গ্রস মার্জিন (টাকা)
ঙ. স্থির খরচ ৫,০০০ টাকা	-	-	-	-	-
চ. খামারের নীট আয় (টাকা)

২. সারণিটি সম্পন্ন করে শিক্ষককে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিন।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. খামার ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ও সিদ্ধান্তগুলো বর্ণনা করুন।
২. বাজেটিং কাকে বলে? বাজেটিং কত প্রকার ও কী কী?
৩. খামার স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়াদি আলোচনা করুন।
৪. খামারের রেকর্ড বলতে কী বোঝায়? খামার রেকর্ড কত প্রকার ও কী কী?
৫. একটি খামারের শস্য পরিকল্পনা প্রণয়নে কী কী বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়?
৬. খামারের নীট আয় কাকে বলে?
৭. খামারের গ্রস মার্জিন বলতে কী বোঝায়?
৮. অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি খামারের আয় ব্যয় নিরূপণ করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

- | | |
|-----------------|--|
| ১। ক. iv | ১। খ. i |
| ২। ক. ব্যবসা | ২। খ. ব্যবসায়ী, ব্যবস্থাপক |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |
| ৪। ক. প্রতিযোগী | ৪। খ. উৎপাদিত ফসল ও পণ্যের অধিকাংশই বিক্রি করা |

পাঠ ৪.২

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iii |
| ২। ক. পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া | ২। খ. বাজেটিং |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |
| ৪। ক. পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়ন | ৪। খ. আংশিক পরিবর্তনের |

পাঠ ৪.৩

- | | |
|---------------------------------|--|
| ১। ক. ii | ১। খ. iv |
| ২। ক. পরিশ্রম, কষ্টসাধ্য | ২। খ. শিক্ষা |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. মি |
| ৪। ক. একক প্রতি উৎপাদন বেশি হয় | ৪। খ. তরুণ ও মধ্যবয়সী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী |

পাঠ ৪.৪

- | | |
|---------------------------------|---|
| ১। ক. iii | ১। খ. iii |
| ২। ক. ক্যাশ বই | ২। খ. খামার যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু |
| ৩। ক. মি | ৩। খ. স |
| ৪। ক. বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব | ৪। খ. বাৎসরিক অবচয়ন = $\frac{\text{বর্তমান মূল্য-অবশিষ্ট মূল্য}}{\text{সম্ভাব্য জীবনকাল}}$ |

পাঠ ৪.৫

- | | |
|--------------------|--|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii |
| ২। ক. সরিষা | ২। খ. খাদ্য শস্য |
| ৩। ক. স | ৩। খ. মি |
| ৪। ক. নগদ পুঁজি কম | ৪। খ. প্রাকৃতিক বিষয় এবং পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ |

পাঠ ৪.৬

- ১। গ ২। খ ৩। খ ৪। গ